একটা
ভালোবাসার
গল্প
লেখাঃ মোহাম্মদ আব্দুল আউয়াল
প্রচ্ছদ: FreePic Ai
ASA Story book

একটা ভালোবাসার গল্প

মোহাম্মদ আব্দুল আউয়াল

প্রকাশকাল
জানুয়ারি ২০২৫

প্রকাশক
মোহাম্মদ আব্দুল আউয়াল

বর্ণবিন্যাস
রবিউল ইসলাম

প্রশ্চদ
FreePic Ai

নকশা
WPS Office

একটা বিকেলবেলা

বিকেল ৫ টা। এটা অন্য সব দিনের মতো নয়। আজকের বিকেলটা অনেক স্পেশাল। শীতের বিকাল। তাছাড়া স্পেশাল হওয়ার আরো একটা কারণ আছে। বিকেল বেলা একটা বড় জাম গাছের নিচে ৫ জন মানুষের আড্ডা। সবাই চাকরি করে। একেকজনে একেক জায়গায় থাকে। ফোনে কথা হলেও দেখা তেমনটা হয় না। কিন্তু আজকে হয়েছে। সেই ছোটবেলায় ৫ জন বন্ধু যেভাবে এই জামগাছটার নিচে গল্পসল্প ঝগড়াঝাঁটি করত। আজকেও তেমনভাবেই তারা বসেছে। সবাই প্রতিষ্ঠিত। সবাই দামী চাকরী করে।

আগে যখন তারা ছোট ছিল, তখন আশেপাশে অতটা ঘরবাড়ি ছিল না। শুনশান নীরব ছিল চারদিকটা। কিন্তু এখন পরিবেশটা অনেকটাই পালটে গেছে। চারদিকে পাকা পাকা দালান উঠেছে। জাম গাছটার সামন দিয়ে সাপের মতো লম্বা রাস্তা। রাস্তা দিয়ে ছুটে যাচ্ছে অটোরিকশা, সিএনজি, প্রাইভেট-কার। পরিবেশটা যে একদিনে এমন হয়ে যাবে, তারা ছোটবেলায় সেটা কল্পনাও করতে পারে নি।
করিম, জাভেদ, সালাম, আরিফ আর বিজয়। এই পাঁচ বন্ধু। করিম, সালাম আর বিজয় দেশের বাইরে থাকে। তারা এক মাসের জন্য ছুটি নিয়ে এসেছে। জাভেদ আর আরিফ দেশেই ভালো একটা কোম্পানিতে জব করে। তাদের ছুটি দশ দিন। এই ছুটির জন্য অবশ্যই তাদের বেতন কাঁটা যাবে। কিন্তু সেটা যাক। বন্ধুত্বই অনেক বড়। বেতন তো পরের মাসে আবার পাওয়া যাবে।

পাঁচ জনের হাতেই চা। আগের মতো গায়ে পড়ে গল্প আর হয় না। এখন চারদিকে লোকজন। সেই আগের মতো গল্প করা যাবে না। চায়ের কাপে চুমুক দিলো আরিফ। কাপটা একপাশে রেখে বলল, সবাই কতো বড় হয়ে গেছি তাই না?
জাভেদ বলল, বড় হবি না তো সেই আগের মতো ছোট থাকতে চাস?
আরিফ বলল, অবশ্যই। ছোট হওয়ার কোন অপশন আছে নাকি রে?
জাভেদ চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলে, আছেই তো?
- কীভাবে?
- একটা বিয়ে করে ফেল। বাচ্চাকাচ্চা হবে। বাচ্চার সাথে সাথে তুইও একটা বাচ্চা হয়ে যাবি।
- ফাজলামো করিস? এতে বয়সটা কি কমবে?
- আরে পাগলা! মনের শিশুই আসল শিশু।
- রাখ তোর মনের শিশু। আগে ছোটবেলায় বাবার কাছে ১০ টা টাকা চাইলে পেতাম। টাকা পয়সা কামাই করার কোন চিন্তা ছিলো না। খাও দাও ঘুমাও। কিন্তু এখন? নিজের রোজগার নিজে করতে হয়। অফিসে যেতে হচ্ছে। বসের ঝাড়ি খেতে হচ্ছে। তার পরেও নিজেকে

কিভাবে শিশু মনে করতে পারি? মনে হচ্ছে আস্তে আস্তে বুড়ো হয়ে যাচ্ছি।
আরিফের কথা শুনে সালাম বলল, এসব কথা বাদ দে তো। বড় তো হতেই হবে। কেউ তো ছোটই থাকে না সারাজীবন। সবাই বড় হয়। এইযে দেখছিস না, মাথার উপরের জাম গাছটা? আমরা ছোটবেলায় গাছটা যেমনটা দেখেছি, এখনো কি গাছটা তেমনটা আছে? আমরা বড় হয়েছি, আমাদের দায়িত্ব বড় হয়েছে। কিছুদিন পর বিয়ে করতে হবে, বউয়ের দায়িত্ব নিতে হবে, বাচ্চার দায়িত্ব, আরো কত কী। আর ছোট হওয়ার চিন্তা করিস না। যেমন আছিস, তেমনটা নিয়েই সুখে থাকার চেষ্টা কর।
বিজয় সালামের কথায় তাল দিয়ে বলল, হুম... কথা সত্য বলেছিস রে ভাই। যেমনই আছি তেমনটা নিয়েই সুখে থাকার চেষ্টা করবি।
বিজয়ের কথা শুনে আরিফ বলল, করো তো বিদেশে বড় দামের চাকরী। নিজের লাইফ নিয়ে চিন্তা নেই। খাও তো বিলাতি খাবার। ঘুমাও বিলাতি বিছানায়। তোমরা আর আমার কষ্ট কিভাবে বুঝবে। নিজে করি সামান্য একটা কোম্পানির চাকরী। তার মধ্যে এই দশ দিনের ছুটির জন্য স্যালারি থেকে ১৬ পারসেন্ট টাকা কেটে রাখবে। কম কথা নাকি।
- তোর এই সামান্য টাকা কেটে রাখলে কী হবে শুনি?
- অনেক কিছুই হবে। কোম্পানির চাকরি। পরিশ্রম করে কামাতে হয়।
বিজয় উপহাসের গলায় বলল, কোম্পানি বুঝি তোকে রিকসা চালাতে দেয়? যে অনেক কষ্টের কাজ।
- তেমনটাই। সারাদিন রিকসা চালাই। প্যাসেঞ্জার রিক্সায় তুলি, প্যাসেঞ্জাররা পয়সা দেয়। সেই পয়সাতেই চলি আমি। হয়েছে তোদের? এবার খুশি?
- তেমনটা হলেই তো খুশি হতাম।
- তার মানে আমাকে রিকসা চালাতে দেখলে তোরা সবাই খুশি হবি?
- অবশ্যই হবো। রিকসা চালানো তো অনেক ভালো কাজ। তুই কোনদিন রিকশাওয়ালাদের পেটে ভুঁড়ি দেখেছিস? তাদের কখনো ভুঁড়ি হয় না। আর এদিকে অফিসে বসে বসে কাজ করতে করতে আমার পেটে একটা ফুটবল গজাচ্ছে।
- আচ্ছা ঠিক আছে। কালকে থেকে তুই নিজেই রিকসা নিয়ে বের হবি। কিছুদিন রিকসা চালালে তোর ফুটবলটাকে ক্রিকেট বল বানাতে পারবি।
বিজয় স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলল, এতে সমস্যা কী? ঠিক আছে। কালকে সকালেই তোদের বন্ধু একটা রিকসা নিয়ে বের হবে। তোদের সামনে দিয়ে আমি রিকসা চালিয়ে যাবো।
বিজয়ের কথায় সায় দিয়ে সবাই বলল, আচ্ছা ঠিক আছে। কালকে দেখা যাবে আমাদের বন্ধু কীভাবে রিকসা চালায়।

সন্ধ্যা নেমে আসছে। জাম গাছটার নিচে আর বসে থাকার মতো অবস্থা নেই। প্রচুর মশা। এখনে আর কিছুক্ষণ বসে থাকলে নিশ্চিত ম্যালেরিয়া বাঁধবে। তাই আজকের মতো এই জাম গাছের নিচের আড্ডাটা স্থগিত করতে হবে। সালাম উঠতে উঠতে বলল, আয় চল আজকে আবার মিতালী মাসীর ওইখানে গিয়ে চা খাই। অনেকদিন ধরে মাসীর চা খাই না।
সালামের কথা শুনে জাবেদ আর আরিফের মুখটা কেমন যেন মলিন হয়ে গেল। মিতালী মাসির চা ছোটবেলায় সবাই খেত। চায়ের সাথে ফ্রি ফ্রি বিস্কিট। অমন আদর আর কেউ করত

না। ঠিক যেন মায়ের মতো। কোন ছেলে মেয়ে না থেকেও যেন তার অনেকগুলো ছেলেমেয়ে ছিলো। মিতালী মাসি নাকি আর এই দুনিয়ায় নেই। কিন্তু তার বানানো চায়ের স্বাদ এখনো সবার মুখেই রয়ে গেছে।

রাত দশটার দিকে বাসায় আসলো বিজয়। এসেই ঘড়টা একটু কোনরকম পরিষ্কার করে নিল। এই রুমটা বিজয়েরই। কিন্তু এখানে থাকা হয় না। রুমের কিছু কিছু জায়গাতে মাকড়সার জালে ভড়ে গেছে। কালকে সেগুলা একটু পরিস্কার করতে হবে। তা না হলে এই মাকড়সাগুলো তাকে তুলেও নিয়ে যেতে পারে। বিজয়ের বাবা এখন বাড়িতেই। আগে সরকারি চাকরি করতো। এখন রিটায়ার্ড। তাই বেশিরভাগ সময় বাড়িতেই থাকেন। তবে এভাবে বসে থাকতে তার নাকি মোটেও ভালো লাগে না। তাই সে একটা প্রাইভেট স্কুলে শিক্ষকের চাকরিটা নিতে চাইছে। বিজয় একবার বলেছিলো, বাবা! এই বয়সে কি তুমি পাগল হতে চাইছো? বাচ্চাদের পড়ানোর মতো ঝামেলার কাজ মনে হয় আমার জন্মে দেখিনি। তুমি সেটা পারবে না। এই শেষ বয়সটাতে আমি চাই না যে তোমার মাথাটা গোল্লায় যাক। কিন্তু তার বাবা একরাম হোসেন সেই কথা মানতে নারাজ। শেষমেশ বিজয় হেরে গিয়ে বলল, হয়েছে। তোমার যা ইচ্ছা করো।
সেদিনের মতো বিজয় শুয়ে পড়ল। শোয়ার আগে বিজয়ের বাবা বিজয়ের কাছে আসলেন। তারপর বিছানায় বসে বললেন, বিজয়! বিদেশে এখন কেমন লাগছে রে?
বিজয় বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, খুব খারাপ লাগছে বাবা। মাঝে মাঝে ইচ্ছা করে, সব কিছু ফেলে তোমার এইখানে চলে আসি। কিন্তু আসা হয় না।
একরাম হোসেন তার ছেলেকে বলে, তোর মা মরে গেছে তা প্রায় ১৭-১৮ বছরের মতো হবে। আমার বয়সটাও কিন্তু তখন অতো বেশি ছিলো না। আশেপাশের লোকজন তো বলেছিলো আমাকে আরেকটা বিয়ে করতে। কিন্তু আমি বিয়ে করি নি। কারণ তোর বয়স কম। নতুন মা তোর সাথে কেমন ব্যবহার করবে তা অনিশ্চিত ছিল। সেই চিন্তায় আর বিয়ে করি নি। তোকে মানুষ করাটাই ছিলো তখন আমার একমাত্র লক্ষ। আর আমি সেটা পেরেছিও। এখন আমার বয়স বেড়ে গেছে। এখন তো আর আমি তোর দায়িত্ব নিতে পারবো না। আমি ভাবছি, তুই তো এই মাসটা দেশেই আছিস। এই মাসেই তুই বিয়েটা করে ফেল।
একরাম হোসেন বিজয়ের দিকে তাকিয়ে দেখতে পান বিজয় ঘুমিয়ে গেছে। ছেলের কপালে একটু আদর করে বিছানা থেকে উঠে পড়ল সে। বাতিটা নিভিয়ে দিল। ঘুমাক। দেশের মাটিতে অনেকদিন ধরে ঘুমায় না ছেলেটা।

সকাল ৮ টা বেজে গেছে। আরিফ ফোন করেছে। ফোনের রিংটোনের শব্দে বিজয়ের ঘুম ভাঙে। ফোনটা রিসিভ করে বিজয়। হ্যালো!
ওপাশ থেকে আরিফ বলে, কীরে মামুর ব্যাটা? তোর ঘুম ভাঙে নি?
- হ্যা। ভেঙেছে তো।
- ওঠ তারাতারি। গতকালকের কথা মনে আছে কী?
- কীসের কথা? অনেক কথাই তো বললাম কাল।
- অইযে... রিসকা চালাবি।
- আরে! এই সামান্য কথাই তুই সিরিয়াসভাবে নিচ্ছিস?

- সিরিয়াসের কী হলো? তুই আমাদের সবাইকে কথা দিয়েছিস। আজকে সেই কথা তোকে রাখতে হবে। ব্যাস। আর কথা বলা যাবে না।
- আরে! আমি এমনি বলেছি।
- কোনো এমনি টেমনিতে হবে না। আমরা রিকসা হাউজের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। তুই তারাতারি চলে আয়।
এই বলে আরিফ ফোনটা কেঁটে দিল। বেচারা বিজয়ের মুখটা এক্কেবারে চুপসে গেল। সে ঝোকের বসেই গতকাল কথাটি বলে ফেলেছিলো। এখন সেই কথার মাশুল দিতে হচ্ছে। কী আর করার। এখন সে যাবে। গিয়ে তার বন্ধুকে দেখিয়ে দিবে যে সে-ও রিকসা চালাতে পারে। রিকসা চালানো মোটেও কোন খারাপ পেশা না।
সকাল বেলা বিজয় কোন নাস্তা করল না। বিজয়ের বাবা অবাক হয়ে ছেলের দিকে তাকিয়ে রইল। আর বলল, কীরে, এতো সকালে কই যাস?
- আরিফ ফোন করেছিলো। যেতে বলেছে।
- এতো সকালে কিসের জন্য দেখা করতে বলেছে? নাস্তা নেই পানি নেই বের হয়ে চলে যাবি?
- বাইরে খেয়ে নেব। সমস্যা নেই।
- আচ্ছা। তারাতারি চলে আসিস। আমিও বাইরে যাব। আসতে দেরি হতে পারে।
- চেষ্টা করব। আর সাবধানে যেও।

কোনরকমে বিজয় বাসা থেকে বের হয়ে আসে। বের হয়েই একটা রিকসা নেয়। তারপর রিকসা হাউজের উদ্দেশ্যে বের হয়। মনে মনে আরিফকে একশো একটা গালি দিতে ইচ্ছে হলো বিজয়ের। ঘড়িতে সারে আটটা বাজে। শীতের সকাল। শহরের বাইরে যে এতোটা শীত পরে জানা ছিল না। ঘড়ে তো দিব্বি গরম গরম ছিলো। আরিফটাও একটা পাগল। যেই শীত পরেছে। কম্বল গায়ে দিয়ে ঘুমা। এই আবহাওয়ায় নিজে তো ঠকঠকিয়ে কাঁপছিস, সাথে বন্ধুকেও কাপাচ্ছিস। আরো কিছুক্ষন পরে বিজয় রিকসা হাউসের সামনে পৌছায়। বিশাল বড় টিনের ঘড়। এইখানে রিকসা ভাড়া দেয় এক দিনের জন্য। ৫০০ টাকায় ভাড়া নিতে হয় রিকসা। রাত বারোটার আগে ফেরত দিতে হবে। রিকসা হাউজের সামনে দাঁড়িয়ে আছে আরিফ আর জাভেদ। বিজয় রিকসা থেকে নেমে ভাড়াটা দিয়ে দুজনের কাছে গিয়ে বলল, তোরা আমার বন্ধু নাকি শত্রু রে? আরিফ বলল, তুই এখন যেটা মনে করিস। জাভেদ বলল, বন্ধুই তো।
- বন্ধু হয়ে থাকলে তো এই শীতের মধ্যে আমার ঘুমের সর্বনাশ করতি না।
আরিফ জাভেদের উদ্দেশ্যে বলল, দেখেছিস, রাজার ছেলে। সকাল ৮ টা বাজে। এখনো ঘুমায়। আর এদিকে আমরা ৬ টায় উঠে গোছল করে ফ্রেশ হয়ে খেয়েদেয়ে অফিসে যাই।
আরিফ বলল, আরে তেমনটা না। বাংলাদেশে কতদিন ধরে ঘুমাইনা বলতো। কোথায় বিদেশের মাটি আর কোথায় আমাদের মাতৃভূমি। এই দেশের মতো দেশ আর কোথাও নেই। আরিফ বলল, হয়েছে তোর দেশের প্রতি ভালোবাসা। আর তোর নাটক দেখতে চাই না। ছোটবেলায় স্কুলে যখন জাতীয় সংগীত গাওয়া হতো। তখন তো গাইতি না। আমাদের পিঠের মধ্যে খোঁচাখুচি করতি।
- মনে মনে তো গাইতাম ঠিকই।

জাভেদ বলল, হুম। হিন্দি গান গাইতি। শুনতাম তো।
বিজয় বিরক্তের সাথে বলল, আমাকে তোরা পেয়েছিস টা কী? এভাবে অপমান করতে তোদের ভালো লাগছে?
জাভেদ বলল, ভালো লাগছে দেখেই তো করছি। ভালো না লাগলে কি আর এভাবে বলতাম তোকে। আরিফ বলল, হয়েছে। বেচাড়াকে ছেড়ে দে। এখন কাজের কাজটা করি। ওর জন্য একটা রিকসা দেখি।

রিকসা হাউজের মালিকের সাথে কথা বলে আরিফ বিজয়ের জন্য একটা ভালো রিকসা নিল। কিন্তু ঝামেলাটা বাঁধল রিকসার ভাড়া মেটানোর সময়। রিকসার ৫০০ টাকা ভাড়াটাও বিজয়ের পকেট থেকে দিতে হবে। কী আর করার। অনেকগুলা গালি জমা হয়েছিল বিজয়ের মুখে। কিন্তু এই পাবলিক প্লেসে সেগুলো ব্যাবহার করা যাবে না। অগত্যা নিজের পকেট থেকেই ৫০০ টাকার চকচকে নোট বের করে রিকসার মালিককে দিতে হল। মনে মনে বিজয় বলল, সময় হলে এই টাকা আমি সুদে আসলে তোর কাছ থেকে গুনে নেব।

এতোক্ষন শীত ছিল। কিন্তু বেলা যতই বাড়ছে, শীতের তীব্রতা কমে গিয়ে রোদের পরিমানটা বাড়ছে। আল্লাহর নাম নিয়ে রিকসাটায় উঠে বসল বিজয়। চালকের সিটে। আর দুই ছাগল বসল পেছনে। আরিফ বলল, এই রিকসাওয়ালা। একটু বাজারের দিকে নিয়ে যাও তো।
সামনে বসে রাগে ফোস ফোস করছে বিজয়। মনে হচ্ছে রিকসা শুদ্ধা দুই ছাগলকে উলটে ফেলে দিতে। কিন্তু কেন জানি পারছে না। এরা কী বন্ধু নাকি শত্রু? নিজের বন্ধুকে রিকসাওয়ালা বলবে তাই? বিজয় রাগটা কোনভাবে কন্ট্রোল করে। নিজের মনকে শান্তনা দেয়, রিকসা চালানো কোন খারাপ পেশা না। অনেকে মানুষই তো চালায়।
বিজয় রিকসা চালিয়ে যাচ্ছে। এতোক্ষন শীতের যে ভাবটা ছিল, সেটা এক্কেবারে কেঁটে গেছে। গরম লাগছে ভালোই। ঘড়িতে ৯:২০ বাজে। বাজারের সামনে এসে পরেছে তিনজনে। বাজারের সামনে নেমে আরিফ বিজয়কে বলল, এখন রিকসা থেকে নাম। আয়, এক কাপ চা খাই। চা খেলে শরিরে শক্তি আসবে। বিজয় বলল, চা তোরা খা। তোদের শক্তি দরকার। আমি খাবো না। আল্লার রহমতে আমার গায়ে ভালোই শক্তি আছে। জাভেদ বলল, তা মিথ্যে বলিস নি। ভালোই শক্তি আছে। ষাড়ের মতো।
- অপমান করলি, নাকি প্রশংশা করলি?
- এখন তুই যেটা মনে করিস। তোর ব্যাপার।
বিজয় মনে মনে বলল, আল্লাহ... এমন বন্ধু তুমি আর কাউকে দিও না। এদের সাথে আমি এতোটা বছর কিভাবে আছি? অন্য কেউ থাকলে তো এতোদিনে পাগলাগারদে থাকতো। ছোটবেলায় এই বন্ধু নামের প্রানীগুলো যে খুব ভালো ছিলো তা মোটেও না। তখন আরো বজ্জাতের হাড্ডি ছিল এরা। বিশেষ করে জাভেদ। আল্লাহ যে ওকে কী দিয়ে বানিয়ে ছিল, কে যানে। বাপ মায়ের একমাত্র ছেলে ছিল জাভেদ। এই ছেলেটা যখন ছোট ছিল। তখন এলাকার মানুষ এই ছেলের জ্বালায় গাছে পেঁয়ারা, আম, ক্ষেতে শশা কিছুই নিরাপদে রাখতে পারতো না। একদিন স্কুলে আসার সময় একটা বড় আপু নাকি জাভেদের গালে টস করে একটা থাপ্পড় মেরেছিলো। জাভেদ কান্না করতে করতে বাড়িতে গিয়ে মায়ের কাছে বিচার দিতে গেল।

জাভেদের মা তো রেগে আগুন। ছেলের গায়ে হাত? তাও আবার ক্লাশ এইটের একটা মেয়ে? তখনি জাভেদের মা রওনা হলো মিতুদের বাড়ি। বাড়িতে গিয়ে সে কী ঝগড়া। আমার একমাত্র ছেলে। চড় মেরেছে। যদি কিছু হয়ে যেত? কে দিত জরিমানা? মিতু ঠান্ডা গলায় বলল, আগে নিজের ছেলের কাছে শুনুন সে কী বলেছে? চড় তো আর সাধে মারি নি।
জাভেদের মা তার ছেলেকে বলে, কী বলেছিস রে মিতুকে?
জাভেদ কান্না জড়িত কণ্ঠে বলল, মিতু আপু আমাকে ফুল দিয়ে বলল, এই জাভেদ... তোকে বিয়ে করবো। আই লাভ ইউ। আমি বলেছি, "না। আমি পারবো না।" তার পর ঠাস করে আমার মুখের উপর বসিয়ে দিল। এই কথা বলে আবার ভ্যা করে কান্না।
মিতুর চোখ দিয়ে যেন আগুনের ফুলকি বের হল। সাথে সাথে ঠাস করে আরো দ্বিগুন শক্তি নিয়ে মায়ের সামনে একটা থাপ্পড় মেরে দিল। "সত্যি বল বলছি, মিথ্যা কেন বলছিস? ফের মিথ্যা বললে আরেকটা বসিয়ে দিব গালের উপর।", মিতু ধমকিয়ে কথাগুলো বলল। জাভেদের মা যেন ঘটনাটা হা করে দেখল। তারপর জাভেদ সত্য কথাটা বলল। সে মিতুকে ফুল দিয়েছিল। মিতুর সাথে প্রেম করবে। এইটুকু বয়সে পেকে গেছে। সেদিন জাভেদের মা তার সাথে কী করেছিল কেউ জানে না। তবে পরদিন সবাই জানতে পারল, ছেলেটার খুব জ্বর।

কিছুক্ষন পর আমরা চা খেলাম। এক কাপ চা না খেয়ে আর পারলামই না। চা-টা খেয়ে আসলেই একটু ক্লান্তি দূর হল। চায়ে চুমুক দিতে যাচ্ছি এমন সময় একটা জিনিস খেয়াল করলাম। একটা মেয়ে। শাড়ি পড়েছে। মাথার চুলগুলো খোলা। গলায় ঝোলানো একটা আইডি কার্ড। কোন একটা জব করে হয়তো। মেয়েটা ছটফট করছে। একবার ডান দিকে তাকাচ্ছে আরেকবার বাম দিকে তাকাচ্ছে। হাতে একটা হ্যান্ড-ব্যাগ। বিজয় কিছুক্ষনের জন্য যেন হাড়িয়ে গেল। এরকম সুন্দর মেয়ে সে আগে কখনো দেখেছে কিনা জানা নেই। বিজয় অনেক্ষন তাকিয়ে থাকার পর বুঝতে পারল মেয়েটা একটা রিকসা খুঁজছে। অনেকগুলো রিকসা থামানোর চেষ্টা করছে, কিন্তু কোন রিকসাই যাচ্ছে না।
বিজয় একসময় চায়ের দোকান থেকে উঠে পড়ল। এটাই সময় মেয়েটার সাথে দেখা করার। বিজয় তার রিকসার সামনে গেল। গিয়ে রিকসায় উঠে বসল। রিকসায় আয়নাতে তাকিয়ে দেখল নিজেনে। কী আজব! নিজেকে এখন পুরোপুরি রিকসাওয়ালাদের মতোই দেখা যায়। তার কী রিকসাওয়ালা হয়ে জন্ম নেওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু ভুলে সে অন্য পেশায় ঢুকে গেছে? বেশি দেরি করা যাবে না। নাহলে মেয়েটা অন্য কোন একটা রিকসায় উঠে যেতে পারে। রিকসার প্যাডেলে পা রাখতেই পেছন থেকে একটা চিকন গলার মেয়ে বলে উঠল, শ্যামপুর রেলগেটে যাবেন? বিজয় মেয়েটার দিয়ে তাকাচ্ছে আর মনে হচ্ছে সে যেন আস্তে আস্তে হ্যালুসিনেট হয়ে যাচ্ছে।
- এই ভাই! আবেন নাকি?
- কো... কোথায়?
- শ্যামপুর রেলগেট?
- যাবো যাবে। অবশ্যই যাবো। উঠে বসুন।
- ভাড়া কতো নেবেন?
- আপনার যা ভালো লাগে তাই দিবেন।

- মানে?
- মানে! যা ভাড়া তাই দিবেন।
"চলুন", বলে মেয়েটা বিজয়ের রিকসায় উঠে বসল। তারপর বিজয় সাবধানে রিকসা চালিয়ে রওনা হল মেয়েটাকে নিয়ে।

এতোক্ষন আমাদের জাভেদ আর আরিফ ঘটনাটা হা করে দেখছিলো। জাভেদ বলল, ব্যাপারটা কী হলো রে?
- আমি কিছুই বুঝতে পারছিনা, তুই-ই বল।
- আমরা দুইজন রিকসাতে উঠেছিলাম বলে রাগে ফুলে গিয়ে আমাদের চৌদ্দ গোষ্ঠি উদ্ধার করলো, আর সে কিনা এই মেয়েকে নিয়ে সরাসরি রিকসায় উঠে ভোঁ... করে চলে গেল?
- এই ওকে ফোন দে তো একটা।
জাভেদ নিজের পকেট থেকে ফোনটা বের করে বিজয়কে ফোন দিল। কিছুক্ষন পরে বিজয় রিসিভ করে বলল, "এই ফোন দিয়েছিস কেন? ফোন রাখ, ট্রিপে আছি।" এই কথা বলে ফোন কেঁটে দিল সাথে সাথে। আরিফ বলল, বুঝেছিস! লারকী কা চাক্কার হ্যা ভাই। সালা আমাদের মুখে ধুলো দিয়ে কিভাবে পালিয়ে গেল দেখলি?
- আরে, মুখে না, চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়েছে।
- চুপ। একদম চুপ থাক। ভেবেছিলাম ওকে নিয়ে একটু রিকসা করে এলাকাটা ঘুড়বো। এখন সালা নাকি ট্রিপে আছে। ইনকাম করবে।
- হুম। পার্ট টাইম জব।
- চুপ।

শাড়ি পড়া মেয়েটা

বিজয় রিকসা নিয়ে ছুটে যাচ্ছে। মেয়েটা পিছন থেকে বার বার বলছে, একটু তারাতারি যান প্লিজ। অফিসে দেরি হয়ে যাচ্ছে। বিজয় বলল, আরে, চিন্তা করবেন না। চেষ্টা করছি তো। এমন সময় বিজয়ের ফোনের রিং বেজে উঠল। বিজয় দেখল জাভেদ ফোন করেছে। কেন ফোন করেছে সেটা সে জানে। ফোনটা রিসিভ করে বলল, "এই ফোন দিয়েছিস কেন? ফোন রাখ, ট্রিপে আছি।" এই কথা বলে ফোন কেঁটে দিল। এখন কারো সাথে কথা বলার মুড নাই।
এমন সময় পেছন থেকে মেয়েটা বলে উঠল, আচ্ছা, আপনার হাতের ফোনটা কি আপনার? এতো দামী ফোন পেলেন কোথায়? বিজয় এই কথার কোন সঠিক জবাব দিল না।
বিজয়য়ের বুকটা ধক করে উঠল। নিজের ফোনটা কেন বের করার দরকার ছিলো? গত মাসেই বিজয় এই ফোনটা কিনেছে। অনেক দামী ফোন সেটা দেখেই বোঝা যায়। এখন সে মেয়েটাকে কী জবাব দিবে?
"কি হলো? কথা বলছেন না কেন?"
বিজয় সাহস নিয়ে বলল, কেন, কি মনে হয়? আমরা রিকসাওয়ালারা কি দামী ফোন ব্যাবহার করতে পারবো না?
- তা তো নিষেধ করি নি।
- শোনেন। রিকসাওয়ালারা রিকসা চালায় বলে যে তাদের কাছে টাকাপয়সা নেই তা কিন্তু মোটাও না। এখনকার রিকসাওয়ালাদের কাছে কিন্তু যথেষ্ঠ টাকাপয়সা আছে। কিন্তু তারা সেটা প্রকাশ করে না।
- আপনি একদম ঠিক বলেছেন। আমাদের থেকে আপনারা অনেক সুখে আছেন। যতদিন থেকে এই জব-এ আছি ততদিন থেকে নিজেকে একটা গোলামের মতো মনে হয়। নিজের ইচ্ছামতো কোথাও যেতে পারি না। এই যেমন আজকে খুব শপিং করতে ইচ্ছে করছে। বাট আজকে আমার সারাদিন একটুও সময় নেই। যদিও শুক্রবারে অফিস ছুটি। তবে সেদিন দেখা যাবে বাসা থেকে বাইরেই যেতে ইচ্ছা করবে না। আর এদিকে আপনারা যা ইচ্ছা করতে পারেন। যখন খুশি তখন চলে যেতে পারেন যেখানে সেখানে। আপনি একটা দামী ফোনও কিনে ফেলেছেন। আর এদিকে আমি দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে এই ফোনটা ইউজ করছি। এখনো একটা নতুন কিনতে পারছি না। বাসা বাড়া, বাজার, বাবা-মায়ের অসুধ, এসব কিনতেই মাসের সব টাকা শেষ হয়ে যায়।
- আসলে সবার জীবনেই কিছু না কিছু সমস্যা থাকেই। সমস্যা না থাকলে কেউ আর খোদাকে মনে রাখত না।
- আই অ্যাম সরি! আপনার সাথে কী না কী বলে ফেলেছি, কিছু মনে করবেন না।

- আরে না। মনের করার কী আছে?
- আচ্ছা, আপনি লেখাপড়া কতদুর করেছেন?
- হঠাৎ! এই কথা কেন?
- আপনার কথা বলার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে আপনি খুব শিক্ষিত। এতো সুন্দর চলিত ভাষায় কোন রিকসাওয়ালাকে আজ পর্যন্ত কথা বলতে দেখি নি। আপনাকেই প্রথম।
- বিজয় বলল, আপনার অফিস চলে এসেছি।
মেয়েটা অবাক হয়ে বলল, আপনি তো যথেষ্ঠ বুদ্ধিমান। এটাই আমার অফিস সেটা জানলেন কিভাবে? আইডি কার্ড দেখে তাই তো? বিজয় সামান্য একটা হাঁসি দিয়ে বলল, হুম সেটাই।
মেয়েটা অফিসে চলে গেল। মেয়েটার যাওয়ার দিকে বিজয় অপলকভাবে তাকিয়ে রইল। দুপুরের দিকে বিজয় রিকসাটা জমা দিয়ে বাসায় চলে গেল। রিকসার মালিক বলল, কী ভাই! এখনি রিকসা জমা দিচ্ছো যে। একটু আগেই তো নিয়ে গেলে। বিজয় সামান্য হেসে বলল, সেটা আপনি বুঝবেন না বড় ভাই। কালকে আবার আসবো। বিজয় চলে আসল সেখান থেকে। তবে মেয়েটার কথা বিজয় সারাদিন একটু সময়ের জন্যও ভুলে থাকতে পারল না। এরকম তো বিজয়ের আগে কখনো হয় নি। একটা মেয়ের চিন্তায় আজকে কোন কাজই ভালোভাবে করতে পারছে না সে। খেতে গিয়েও সে ভালোভাবে খেতে পারল না। একরাম হোসেন বলল, কীরে! এমন তাড়াহুড়ো করে খাচ্ছিস কেন? কী হয়েছে? বিজয় বলল, কিছুনা। এমনি।
- বন্ধুদের সাথে কোথায় গিয়েছিলি?
- একটু ঘুড়তে গেছিলাম।
- গেলি তো দেখলাম। মাথার চুলটাও আঁচড়িয়ে গেলি না। খাওয়াদাওয়া তো দূড়ের কথা। কিসের জন্য যেতে বলেছিলো সেটা বল এখন।
বিজয় রাগ দেখিয়ে বলল, তুমি এতো চিন্তা করছো কেন সেটা আমি বুঝতে পারছি না। বন্ধুরা এমনি ডেকেছিলো। একটা দরকারে।
- তো দরকারটা তাহলে আমাকে বলা যাচ্ছে না।
- সত্যি বলতে, না। বলা যাচ্ছে না।
- ঠিক আছে। আমিও আর জানতে চাইবো না। তোর ইচ্ছা হলে বলিস।
- আচ্ছা।
সেদিন রাতেও বিজয়ের ভালোমতে ঘুম আসলো না। কখন সে আবার সেই মেয়েটাকে দেখতে পারবে সেই চিন্তাগুলোই মাথার মধ্যে ঘুড়পাক খাচ্ছে। সেদিন রাতে বিজয় একটা স্বপ্নও দেখে ফেলল। স্বপ্নটা অনেক সুন্দর ছিলো। সেই মেয়েটাকে নিয়ে। কিন্তু কি আজব! সকালে ঘুম থেকে উঠে সেই স্বপ্নটার ঘটনা কিছুতেই মনে করতে পারল না।

পরদিন বিজয় ঘুম থেকে উঠে ভালোমতে পরিপাটি হয়। নাস্তা খেয়ে নেয়। তারপর বাবাকে বলে, বাবা, বাইরে যাচ্ছি। কিছুক্ষন পরেই এসে পড়বো। বিজয় তারাতারি করে বের হয়ে যায়। একটা রিকসা নিয়ে রিকসা হাউজের সামনে যায়। রিকসার মালিকের সাথে আজকেও সে কথা বলে। ৫০০ টাকা ভাড়া। বিজয় একটা নিয়ে নেয়। হাতে বেশি সময় নেই। ঘড়িতে ৯ টা ১০ বাজে। বাজারের সামনে যেতে হবে জলদি। নইলে মেয়েটা অন্য কোন রিকসায় উঠে পড়বে।

তখন আমও যাবে ছালাও যাবে। বিজয় তারাতারি পেডেল চালায়। তাকে দেখে কেউ রিকসাওয়ালা ব্যতিত অন্য কিছু মনে করবে না। চলার পথে অনেকগুলো মানুষের "এই রিকসা" ডাক উপেক্ষা করে বিজয় এগিয়ে চলল। ৯ টা ৩০ বেজে গেছে। বিজয়ের কপালে ঘাম। নিশ্চই মেয়েটা আজকে অন্য কোন রিকসায় চলে গেছে। বিজয় হতাশ হয়ে বাজারের সামনে পৌছাল। চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখল সে। কই? নেই তো। তাহলে কি রিকসা নেওয়াটাই আজকে লস হল?
বিজয়ের চোখের পাতা কেঁপে উঠল। সাথে বুকটাও। হ্যা। পা-ও কাঁপছে। অইযে মেয়েটা। বিজয়ের দিকেই তাকিয়ে আছে। শুধু তাকিয়ে আছে না। মেয়েটা রিকসার দিকে এগিয়েই আসছে। বিজয় গতকালকের মতেই অবাক হয়ে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে আছে। বিজয়ের চেতন ফিরল একটা লোকের ধমকে। আরেকজন রিকসাওয়ালা। পেছন থেকে বলল, অই হুমুন্দির পো! গাড়ি হড়া কইলাম। নইলে ধাক্কা দিমু। বিজয় এরকম কথার জন্য প্রস্তুত ছিলো না। কিন্তু আশেপাশে মানুষ এবং সেই মেয়েটা। বিজয় রিকসাটা একপাশে সরিয়ে নিল।

"কেমন আছেন?"
মেয়েটার কথার উত্তরে বিজয় বলল, ভালো আছি। আপনি?
- এইতো। আর ভালো।
- মানে?
- মানে কালকে আমার কাছ থেকে রিকসা ভাড়া নিয়েছেন? আমিও আপনার ভাড়া দিতে একদমই ভুলে গেছিলাম। অফিসে দেরি হয়ে গেছিলো। এই নিন ১২০ টাকা ভাড়া। আজকের আর কালকেরটা মিলে। বিজয় টাকাটা নিয়ে পকেটে রাখল।
মেয়েটা রিকসায় উঠে বসল। বিজয় মেয়েটার অফিসের দিকে রওনা হল। মেয়েটা বলে উঠল, আচ্ছা! আপনি কি এখান দিয়েই রিকসা চালান? নাকি অন্য কোথাও যান।
- এখানেই চালাই।
- এখন থেকে ঠিক ৯ টার সময় আমার জন্য অইখানটাতে অপেক্ষা করবেন। প্রতিদিনই দেরি হয়ে যায়।
বিজয়য়ের মনের ভিতরে একটা ঝড় চলছে। এই মেয়েকে রিকসায় করে প্রতিদিন অফিসে নিয়ে যেতে হবে। ভেবেই বিজয়ের কেমন যেন লাগতে লাগল। এক ধরনের ভালো লাগা। বলে বুঝানো যাবে না।
কিছুক্ষন পরে মেয়েটা নেমে গেল। আর বলে গেল, কালকে সকালে সময়মতো এসে পড়বেন। বলেন তো কয়টার সময়?
- নয়টায়।
- ঠিক। মাথায় থাকে যেন।
মেয়েটা অফিসে ঢুকে গেল। বিজয়ের কাজ শেষ। গতকালকের মতো আজকেও সে রিকসাটা জমা দিয়ে দিল। রিকসার মালিক বলল, কী ভাই! সত্যি কথা বলো তো, তুমি রিকসা দিয়ে কী করো?
বিজয় হেঁসে বলল, কী আবার, চালাই।
- তাইলে এতো তারাতারি ফেরত দেওয়ার কারণটা জানতে পারি?

- বলা যাচ্ছে না এখন। তবে সময় হলে সব খুলে বলবো। আর হ্যা। কালকেও কিন্তু যথা সময়ে আসবো। একটা ভালো রিকসা রেডি রাখবেন।
বিজয় সেদিন চলে আসল। তার মুখে যেন বিজয়ের হাসি। কালকেও সে মেয়েটার সাথে দেখা করবে। আচ্ছা। মেয়েটাকে তার পছন্দ হয়। এই কথা সে কবে বলবে তাকে। মেয়েটার চিন্তায় তার রাতে ঘুম হয় না। একরাম হোসেন ছেলের দিকে তাকিয়ে বলেন, তুই দুদিন ধরে যা করছিস, সেগুলা আমার কাছে খুব সন্দেহ লাগছে। সত্যি করে বলতো, তুই আমার থেকে কি লুকাচ্ছিস। বিজয় এখন কোন কথা বলে না। একরাম হোসেন আবার বলেন, আমার স্কুলের চাকরিটা হয়ে গেছে। কালকে থেকে পড়াতে যেতে হবে। আমাকেও সকালে যেতে হবে।
- কয়টার সময় বাবা?
- ৯ টায়।
- ভালো। বলেছিলাম এই শেষ বয়সে মাথা খেও না। তা আমার কথা শুনলে না তো। আমি আর কী বলবো। তোমার যা ভালো লাগে তাই করো। তা স্কুলটা কোথায়?
- অই শ্যমপুর রেলগেট এর কাছে।
তারমানে অই মেয়েটার অফিস আর বাবার স্কুল দুইটা একই জায়গায়? এতে বিজয়ের সুবিধা হলো নাকি অসুবিধা হলো সেটা সে ধরতে পারলো না। তবে মনে হল একটু অসুবিধাই হলো। তাই সে বাবার কথা শুনে হা করে রইল। তার বাবা বলল, কিরে, এভাবে তাকিয়ে আছিস কেন আমার দিকে? বিজয় বলল, কিছুনা বাবা।

পরদিন সকালে বিজয় আগের দিনের চাইতে একটু আগেই রওনা হল। যাওয়ার সময় বিজয়ের বাবা বলল, প্রতিদিন সকালে তুই কোথায় যাচ্ছিস সেটা আমাকে বলছিস না। আমি জানি তুই আমার কাছ থেকে কিছু একটা লুকাচ্ছিস। তবে কী লুকাচ্ছিস সেটা আমাকে বলছিস না।
- বাবা, সেরকম কিছু কেন হতে যাবে বলো তো। আমি বড় হয়েছি না? আমি কি এখন ঘড়ে বসে থাকার ছেলে? আর অনেক দিন ধরে এলাকার খোঁজখবর নেই না। তাই এখন একটু বের হই। আর তুমি খেয়েদেয়ে স্কুলে চলে যেও। আমি একটু পরেই এসে পড়বো।
বিজয় বাসা থেকে বের হয়ে আসে। আচ্ছা, বিজয় বাবাকে মিথ্যা বলে কি ঠিক কাজ করল? সত্য কথাটা বললে কি কোন সমস্যা হতো? এর উত্তর সে জানে না। তবে সত্য কথা বললে হয়তো তার বাবা একটু বিশেষভাবে অবাক হতো। তার ছেলে সামান্য একটা মেয়ের জন্য প্রতিদিন রিকসা চালাচ্ছে। এটা সে নাও মেনে নিতে পারতো। ঘড়িতে সময় সকাল সারে সাতটা। আজকেও প্রচন্ড শীত। রিকসা হাউজে গিয়ে রিকসা নিল বিজয়। তারপর রওনা হলো বাজারের দিকে।
শীতে কুয়াশায় ভালোভাবে কিছু দেখা যাচ্ছে না। সেই কুয়াশা ভেদ করে বিজয় এগিয়ে চলল রিকসা নিয়ে। মাঝে মাঝে ক্রিং ক্রিং শব্দ করে বেল বাজাচ্ছে সে। অকারণেই। এই শব্দটাতে তার কিসের যেন একটা সৃতি জড়িয়ে আছে। কেন যানি এই শব্দটা তার কাছে প্রচন্ড ভালো লাগে। কী সেই সৃতি? সেটাও সে মনে করতে পারছে না। বাজারে এসে বিজয় ভাবল, শ্যামপুরে যদি বাবার সাথে কোনভাবে রিকসা চালানো অবস্থায় দেখা হয়ে যায়, তাহলে একটা বিরাট ঝামেলা হয়ে যাবে বোঝা যাচ্ছে। এর থেকে বাঁচার উপায় হচ্ছে মাক্স। মুখে মাক্স দিলে আর দেখা যাবে না। তাই বিজয় দোকান থেকে একটা মাক্স কিনে সেটা মুখে পড়ে নিল।

তারপর রিকসাটা একটা ফাঁকা যায়গায় নিয়ে একটা দোকানের সামনে গিয়ে বসল। মেয়েটা আসতে এখনো অনেক দেরি। কেবল, আটটা বাঁজে। আরো এক ঘন্টা। এতোক্ষন কী করা যায়? এক কাপ চা খেলে কেমন হয়? বিজয় চাওয়ালাকে বলল, মামা! এক কাপ রঙ চা দিও চিনি বেশি করে।

চাওয়ালা চা দিয়ে গেল। বিজয় একটা চুমুক দিতে যাবে তখন সে দেখল, মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে রিকসার জন্য। আজব। এখন কেবল ৮ টা ২০ বাজে। আজকে মেয়েটা এতো আগেই আসলো কেন? বিজয় চা-টা পুরোপুরিভাবে খেতে পারলো না। চাওয়ালাকে টাকা দিয়ে দোকান থেকে বের হয়ে গেল সে। রিকসার কাছে গেল বিজয়। আজকে মেয়েটা শাড়ির উপরে একটা কালো সোয়েটার পড়েছে। এই মেয়ে যেটাই পড়ুক সেটাই দারুন মানায় দেখা যাচ্ছে। বিজয় রিকসায় উঠে বসল। তারপর মেয়েটাকে বলল, আজকে এতো তারাতারি এলেন যে। কোন দরকারি কাজ আছে? মেয়েটা অল্প কিছুক্ষন চিন্তা করে বলল, কোন কাজ নেই। তবে আজকে একটা জায়গায় যেতে চাচ্ছি।
- কোথায়?
- সেটা গেলেই বুঝতে পারবেন।
- উঠে বসুন তাহলে।

বিজয় রিকসা চালাতে আরাম্ব করল। মেয়েটা পেছনে চুপ করে বসে আছে। বিজয় মেয়েটার নিরবতা ভাঙ্গার চেষ্টা করার জন্য বলল, আচ্ছা আপনার সাথে অনেক দিন ধরে কথা হচ্ছে, কিন্তু আমি এখনো আপনার নামটাই জানতে পারলাম না। মেয়েটা একটু হেসে জবাব দিল, আমার নাম জেনে আপনার লাভটা কী?
- সবখানে লাভ খুঁজেন কেন? সবকিছুতেই কি লাভ পাওয়া যায়?
- জানিনা সেটা। আমার নাম মিতু। নামটাও আমার আইডি কার্ডে লেখা আছে। কিন্তু একটু ছোট, তাই হয়তো দেখতে পান নি। তো আপনার নামটাও তো জানা হলো না।
- আমার নাম বিজয়।
- বিজয়, ভিক্টোরি। অনেক সুন্দর নাম।
রিকসাটা অনেক্ষন চালানোর পর মেয়েটা একটা জায়গায় থামতে বলল। রিকসা থামার পর মিতুও রিকসা থেকে নামল এবং বিজয়কেও নামতে বলল। জায়গাটা অনেকটা শুনশান। আশেপাশে কোন মানুষের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। মেয়েটা কিছুক্ষন হেঁটে যাওয়ার পর একটা জায়গায় গিয়ে থামল। বিজয় অবাক হয়ে দেখল এটা একটা গোরস্থান। এতো জায়গা থাকতে মিতু গোরস্থানে কেন আসল? বিজয় আরো একটু এগিয়ে গেল। বিজয় খেয়াল করল, মেয়েটা একটা কবরের সামনে গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। বিজয় মেয়েটাকে কিছু বলতে গিয়েও কিছু বলতে পারলো না। আচ্ছা! মেয়েটার চোখে কি জল এসেছে? চোখ দুটো দেখা যাচ্ছে না। তবুও বিজয়ের অবচেতন মন জানান দিল মেয়েটা কান্না করছে। কিন্তু কেন?

মিতু আবার রিকসায় উঠে বসল। বিজয়কে হাল্কা গলায় বলল, এইবার চলুন। বিজয় রিকসায় উঠে আবার মেয়েটার অফিসের দিকে রওনা হল। বিজয়ের মাথায় শুধু এটাই ঘুড়পাক খাচ্ছে

যে অই কবরটা কার? তখনি মিতু পেছন থেকে বিজয়কে বলল, আপনি ভাবছেন অইটা কার কবর, তাই না? বিজয় এর কোন জবাব দিল না। কিন্তু মেয়েটা বলতে আরাম্ব করল, আসলে, আমার সামনে যেই কবরটা ছিলো, অইটা আমার বড় ভাইয়ের কবর। বিজয় অবাক হয়ে বলল, আপনার বড় ভাই?
- হ্যা। ভাই মারা গেছে প্রায় ৫ বছর হয়ে গেল। আমার ভাই নতুন চাকরিতে জয়েন করেছিলো। অনেক দামী চাকরি। লেখাপড়াতেও অনেক ভালো ছিলো। বাবা ভাবলেন, এইবার হয়তো সে নিজে একটু বিশ্রাম নিতে পারবেন। কিন্তু বাবার কল্পনাটা আর বাস্তব রুপ নিতে পারল না। একদিন কলেজ থেকে আসার পর জানতে পারলাম, আমার ভাই কার অ্যাকসিডেন্ট করেছে। খুব খারাপ অবস্থা। আমি হাসপাতলে যাওয়ার পর আমার ভাইকে আর জীবিত দেখতে পারি নি।
এই বলে মিতু সেখানেই শব্দ করে কেঁদে উঠল। কিন্তু এই মুহুর্তে মেয়েটাকে শান্ত করার মতো কোন ভাষা খুঁজে পেল না বিজয়। চুপচাপ মেয়েটার কথা শুনে গেল সে।

অবশেষে মেয়েটার অফিসে এসে রিকসা থামাল বিজয়। মেয়েটা রিকসা থেকে নেমে ভাড়া দেওয়ার সময় বিজয় বলল, থাক। আজকে আর ভাড়া দিতে হবে না। আপনি যান। আপনার অফিসের আজকে অনেক দেড়ি হয়ে গেছে। অন্য কোন মেয়ে থাকলে জোর করেই ভাড়াটা রাখার জন্য অনুরোধ করত। কিন্তু এক্ষেত্রে মিতু হচ্ছে ব্যাতিক্রম। মেয়েটা চুপ করে অফিসের দিকে রওনা হয়ে গেল। বিজয় আগের দিনের মতোই মেয়েটার চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রইল। অফিসে ঢোকার পরে মেয়েটা পুনরায় বিয়য়ের দিকে তাকাল। দুজনের চোখ একে অপরের সাথে কিছুক্ষনের জন্য আটকে গেল। ওভাবে তাকাল কেন মেয়েটা? বিজয়ের মনের মধ্যে নানান প্রশ্ন ঘুড়পাক খেতে লাগল।

আজকে শুক্রবার। আজকে এবং কালকে মেয়েটার সাথে আর দেখা হচ্ছে না। মেয়েটাকে দেখার জন্য তার কেমন জানি মনটা ছটফট করতে লাগল। কী করা যায় তাহলে? বাসায় কোনভাবেই মন টিকছে না তার। মেয়েটার মোবাইল নাম্বারটা নিতে পারলে অনেক ভালো হত। কিন্তু সেটা নেওয়ার সাহস হয় নি বিজয়ের। ভেবেছে একদিন মেয়েটার নাম্বার নিবে। মাঝে মাঝে কথা বলবে। কিন্তু কী সম্পর্কে কথা বলবে? নিজের ভালোবাসার কথাটা প্রকাশ করবে? নাকি এমনি টুকিটাকি আলাপ আলোচনা করবে? ধুর এসব কী ভাবছে বিজয়। নাম্বারই তো নেই। এখনো তারা একে অপরকে ভালোভাবে চেনে না। এই কয়দিনের পরিচয়। কিন্তু তবুও। মেয়েটাকে এতো পছন্দ হয় কেন বিজয়ের? মেয়েটার জন্য রাতে ঘুম হয় না। মিতু। মেয়েটার নাম মিতু। নামটাও তো দারুণ। মিতুর কথা যখন তার মনে পরে বুকটা কেমন জানি করে ওঠে। অজানা এক ধরনের অনুভুতি।

বিকেলবেলা। আজকেও জাম গাছের নিচে বন্ধুদের আড্ডা বসেছে। সবার হাতেই চা। চারদিকে কুয়াশার চাদর আস্তে আস্তে নেমে আসছে। বোঝা যাচ্ছে প্রচন্ড শীত পরবে। তবুও এখানটাতে মানুষের ভিড়। আশেপাশের কিছু দোকানে এখন থেকেই চা সিঙ্গারার ব্যাবসা জমে উঠেছে। চলবে অনেক রাত পর্যন্ত।

আরিফ বলল, ইদানীং বিজয়কে দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে না। কারণটা কি? কোথাও থাকা হয় ওর?
সামাদ বলল, আমিও তো সেটাই ভাবছি। কোথায় থাকিস সারাদিন।
বিজয় আসামিদের মতো করে জবাব দিল, কই আবার থাকবো। কিছুদিন ধরে বাসায়ই থাকি। কিছুদিন ধরে শরিরটা একটু খারাপ। তাই বাইরে কোথাও যাই না।
কথাটা শুনা মাত্রই জাভেদ বলল, ভালোই তো মিছে কথা বলতে পারিস। আজকে তোর বাবার সাথে দেখা হয়েছিলো। তোর কথা বলেছিলাম। তুই নাকি প্রতিদিন সকালে বাসা থেকে বের হয়ে আমাদের সাথে দেখা করতে আসিস? কই। তোকে তো সকালে কোথাও দেখা যায় না। আমাদের সাথেও তো দেখা করিস না। তাহলে যাস কোথায়?
আর সেদিন তো একটা মেয়েকে নিয়ে রিকসায় করে দিলি দৌড়। তারপর থেকে আর তোর ছায়াও আমরা কেউ দেখতে পাচ্ছি না। কারণ কী এর?
বিজয় বিরক্ত গলায় ঝাকি দিয়ে বলল, থামবি তোরা। তোরা সবাই বিচারক, আর আমি একাই আসামি। আমাকে নিয়ে তদন্ত করা বাদ দে তো।
সামাদ শান্ত গলায় বলল, হয়েছে তো। থাক। আর কথা বাড়াতে হবে না। বিজয়ের ব্যাপারে কথা বাদ। কোথায় যায় না যায় সেটা তো ওর স্বাধীনতা তাই না। যত তারাতারি পারিস, প্রসঙ্গটা পাল্টানোর চেষ্টা কর।
সামাদের কথাটার পর বিজয়কে নিয়ে সেখানে কোন কথা হল না। কয়েকজন বন্ধু মিলিত হলে কোন প্রসঙ্গ খুঁজে পাওয়া যাবে না, সেটা তো আর হয় না। নানান কথা। হাসি তামাসা। আস্তে আস্তে সুর্যটাও ডুবে যাচ্ছে। সন্ধ্যার পরে অনেকে ঘড়ে চলে গেল। যেন আস্তে আস্তে পরিবেশটা খালি হচ্ছে। জাম গাছটার তলায় মশার উৎপাত শুরু হতে যাচ্ছে এখন। যত তারাতারি সম্ভব এখান থেকে কেঁটে পরা ভালো। জাভেদ বলল, চল এখান থেকে। এখানে আর থাকা সম্ভব হচ্ছে না। চল.. দোকানে গিয়ে গরম গরম সিঙ্গারা খেয়ে শরিরটাকে গরম করে আসি।

পরিচয়

এই দুইটা দিন বিজয়ের কাছে মনে হচ্ছিল দুইটা বছরের সমান। কোনভাবেই যেন কাঁটতে চাইছিল না। কিন্তু দিন তো আর থেমে থাকবে না। পরদিন রবিবারে বিজয় আবার রিকসা নিয়ে বের হল। মুখে মাস্ক। গায়ে একটা শার্ট। তবে এই শার্টটা বাবার। বিজয়ের কাছে যেগুলো আছে, সেগুলো অনেক দামী। তাই বাবার শার্টটাই এক কথায় চুরি করে আনা হয়েছে আরকি। রিকসা চালালে বিজয়ের মোটেও শীত লাগে না। গরমে প্রায় ঘেমে যায় যায় অবস্থা। বিজয় মনে মনে ভাবে, আমার মতে প্রতিটা মানুষেরই সকাল বেলা এভাবে রিকসা চালানো উচিৎ। এভাবে রিকসা চালালে জিমে গিয়ে টাকা খরচ করার কোন দরকারই নেই।
কিছুক্ষন পরেই বিজয় বাজারের সামনে গিয়ে রিকসাটা থামাল। একটু পরেই মিতু আসবে। এসেই রিকসায় বসবে। আজকে বিজয় ভেবে রেখেছে, মেয়েটার কাছে সে ফোন নাম্বারটা চাইবে। এখন মেয়েটা দিলে হয়। নাও দিতে পারে। নাম ছাড়া একে উপরের কোন কিছুই জানে না। দুজনের পরিচিত না তারা। কিছুক্ষন পরে মিতু আসল। তারপর বলল, কী খবর আপনার? কেমন আছেন? বিজয় বলল, এইতো, ভালোই আছি।
মেয়েটা রিকসায় উঠে বসল। তারপর বলল, চলুন।

বিজয় রিকসা নিয়ে এগোচ্ছে। আজকে কথাটা বিজয়ই আরাম্ব করল। আচ্ছা, আপনি কিছুদিন ধরেই আমার রিকসাতেই যাচ্ছেন? এর কারণ কী?
 - আপনিই তো আমার জন্য রিকসা নিয়ে অপেক্ষা করেন। আপনি অপেক্ষা করার পরেও যদি আমি অন্য কোন রিকসায় উঠে যাই। তাহলে আপনার প্রতি একটা খারাপ ব্যাবহার হলো না?
 - আপনিই তো আমাকে অপেক্ষা করতে বলেন। তাই তো অপেক্ষা করি।
মেয়েটা একটু ভ্রু কুচকে বলল, তারমানে আপনি বিরক্ত হচ্ছেন।
 - না না। বিরক্ত হতে যাবো কেন? বরং ভালোই লাগে?
 - ভালো লাগে মানে?
 - মানে.. ইয়ে আরকি.. আপনার সাথে ভালোভাবে কথা বলা যায়। অন্য কোন যাত্রীর সাথে তো এভাবে কথা বলতে পারি না। সবাই তো আর আপনার মতো ভালো ব্যাবহার করে না।
 - ধন্যবাদ।
 - ধন্যবাদ কিসের জন্য?
 - দিলাম এমনি। আর হ্যা। কালকে বিকেলে আমরা একটা অনুষ্ঠানে যাবো। আমি আর আমার চাচাতো বোন। ভেবেছি, আপনার রিকসাতেই যাবো। যাবেন কালকে?
 - আপনি বললে অবশ্যই যাবো। কখন কোথায় রেডি থাকতে হবে শুধু এটা বলে দেন। যথা সময় গিয়ে আমি উপস্থিত থাকবো।
 - কালকে আমার বাসার সামনে যাবেন। আমি বাসার ঠিকানা দিচ্ছি।

বিজয় এই জিনিসটাই এতদিন ধরে খুঁজছিল। মেয়েটার বাসার ঠিকানা। আজকে মেয়েটা নিজের ইচ্ছাতেই ঠিকানাটা দিল। তারপর বলল, কালকে আমি অফিসে ছুটি নিয়েছি। তাই সকালে আমার জন্য অপেক্ষা করতে হবে না। আপনি বিকাল চারটায় আমার বাসার সামনে এসে পরবেন।
মেয়েটাকে অফিসে রেখে এসে বিজয় রিকসাটা জমা দিয়ে এসে সেখান থেকে সরাসরি বাসায় চলে আসল। যেন মনে হয় এটাই তার রোজকারের ডিউটি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রাতে খাওয়ার সময় বিজয়ের বাবা বিজয়কে বলল, অনেকদিন পর পর তো দেশে আসিস। তোকে কতবার বলি, তুই এইবার একটা বিয়ে করে ফেল। আমি নিজে আর কত কিছু সামলাবো। আমারো তো বয়স হয়ে গেছে।
বিজয় খেতে খেতেই জবাব দিল, করবো বাবা। সময় হলেই করে ফেলব।
 - তুই বলতে চাচ্ছিস, এখনো তোর সময় হয়নি? এতো বড় হয়ে গেছিস। চাকরি করিস। তাও বলছিস সময় হয় নি।
 - তুমি কেন বুঝতে পারছো না বাবা। আমি অই সময়ের কথা বলিনি। আমি বলেছি, আমি বিয়ে করবো। তবে তোমার আর আমার দুইজনেরই পছন্দে।
 - সেটা তো না বলিনি। কেন? হটাৎ এই কথা কেন? কাউকে পছন্দ হয়েছে?
 - তেমনটা না বাবা।
 - পছন্দ থাকলে বল। আমি কথা বলবো মেয়ের ফ্যামিলির সাথে।
বিজয় খাওয়া শেষ করে বলল, সেটা পরে দেখা যাবে। সময় হলে তোমাকে ঠিকই বলবো।
 - তারমানে তুই কাউকে পছন্দ করিস। আর সেটা তুই আমাকে এখন বলছিস না। সময় হলে বলবি?
 - ধরে নাও তেমনটাই বাবা। এখন তারাতারি খাও। খেয়েদেয়ে শুয়ে পরো। তা স্কুল কেমন চলছে? বাচ্চারা বিরক্ত করে না?
 - বাচ্চাদের কাজই তো বিরক্ত করা। একটু একটু তো করবেই। ওসব সহ্য হয়ে গেছে। ছোটবেলায় তুইও কম দুষ্টু ছিলি না।

সেদিন বিজয় শুয়ে পড়ল। ঘুমানোর আগে জাভেদ ফোন করল। জাভেদ বলল, কী খবর বিজয়? কোথায় থাকিস?
 - থাকি বাসাতেই।
 - কিছুদিন ধরে তুই আমাদের সাথে ভালোভাবে কথা বলছিস না। তুই মনে হয় আমাদের দুজনের উপরে রাগ করেছিস। তোকে ওভাবে রিকসা চালাতে দেওয়াটা আমাদের ঠিক হয় নি। আমাকে মাফ করে দিস বন্ধু।
 - বাব্বা। আজকে রাতে কি আকাশে সুর্য উঠল নাকি রে? এভাবে কথা বলছিস কেন রে?
 - ঠাট্টা করে বলছি না। আসলেই বলছি। ভাবলাম, তুই হয়তো আমাদের উপরে রাগ করে আছিস।
 - ধুর! ফালতু কথা বলিস না। রাগ করতে যাবো কেন তোদের সাথে? রিকসা চালাতে দিয়েছিলি। রিকসা চালিয়েছি। ভালোই লেগেছে। ওসব নিয়ে তুই ভাবিস না। কিছুদিন ধরে

একটু ব্যাস্ত আছি।
- তোর আবার কিসের ব্যাস্ততা এখন?
- পরে বলবো।
- সেদিন আমাদেরকে চায়ের দোকানে একলা রেখে একটা মেয়েকে রিকসায় করে নিয়ে উড়ে গেলি। বলি মেয়েটা কিন্তু জোস ছিল।
- ধুর। কী সব বলছিস।
- আমাদেরকে বোকা বানিয়ে লাভ নেই বন্ধু। সুন্দরী মেয়ে। একটু ফিলিংস তো থাকবেই। বলতে লজ্জা পাচ্ছিস কেন?
- তা তো ঠিক। কিন্তু বন্ধু, আমি একটু বেশিই ভেবে ফেলেছি। আমি মেয়েটার প্রেমে পড়ে গেছি।
- বলিস কী। প্রথম দেখাতেই ভালোলাগা?
- তেমনটাই। একমাত্র তোকেই কথাটা বললাম। কাউকে বলিস না।
- বলবো না কেন? এটা তো সবাইকে বলারই কথা। ভেবেছি এখনি সবাইকে কথাটা ফোন করে জানিয়ে দেব।
- না। তেমনটা এখনি করিস না। সময় হলে বলিস সবাইকে।
- তা। মেয়েটার ঠিকানা আছে?
- হুম। আজকে মেয়েটা নিজেই আমাকে দিয়েছে।
- বলিস কী। তাহলে তো ব্যাপারটা অনেক দূর পর্যন্ত গড়িয়ে গেছে।

সেদিন রাতে বিজয় আর জাভেদের মধ্যে অনেক কথা হল। কথাবার্তা বলে সেদিনের মতো ঘুমিয়ে পড়ল। আচ্ছা, মেয়েটার কী কোন বয়ফ্রেন্ড আছে? তাই যদি হয়, তাহলে ব্যাপারটা কেমন হবে? বিজয়ের মনের মধ্যে এই চিন্তাটা বার বার ঘুড়পাক খেতে লাগল। এখন তো কিছু কিছু মেয়েদের ক্ষেত্রে দেখা যায় তাদের আগে থেকেই কোথাও রিলেশনশিপে থাকে। এই মেয়েটার ক্ষেত্রেও যদি তেমনটা হয়? তাহলে কেমন হবে? তবে তেমনটা নাও হতে পারে। সাধারণ একটা মেয়ে। বয়ফ্রেন্ড থাকলে অবশ্যই তাকে নিয়ে একবার হলেও রিকসায় উঠত। অফিসে যাওয়ার আগে তার সাথে একবার দেখা করার জন্য আসতো। কিন্তু তেমনটা তো হচ্ছে না। একা মেয়ে। বড় ভাইটা মারা গেছে কিছুদিন আগে। বাবা-মা অসুস্থ। বিজয় খেয়াল করেছে মেয়েটার চোখের নিচে কালো দাগ। সংসারের খরচের বোঝা মেয়েটা একাই মাথায় নিয়েছে।
এসব ভাবতে ভাবতে বিজয় সেদিনের মতো ঘুমিয়ে গেল।

পরদিন বিকেলবেলা বিজয় রিকসা নিয়ে সেই ঠিকানায় রওনা হয়ে গেল। সাড়ে তিনটা বাঁজে। আধা ঘন্টার মধ্যেই ওরা রেডি হয়ে অপেক্ষা করবে। এখনি বিজয়ের কেমন যেন শীত শীত করছে। আর কিছুক্ষন পরে কুয়াশাও পড়ে আসবে। বিজয়ের গায়ে হালকা একটা সোয়েটার। বিজয় এর আগেও এদিকে এসেছে। তবে সেটা অনেক ছোটবেলায়। এখন চারদিকে বিল্ডিং উঠে গেছে। আরেকটু সামনেই মেয়েটার বাসা। বিজয় রিকসার গতি বাড়িয়ে দিল। একসময় মেয়েটার বাসার কাছে এসে বিজয় থামলো। বাসাটা চার তলা। মেয়েটা কয় তলায় থাকে সেটা

সে জানে না। তবে এটাই সেই মেয়েদের বাসা এটা নিশ্চিত। এই বাসার ঠিকানাটাই তো দিয়েছিলো। বিজয় কয়েকবার রিকসাটার বেল বাজালো। আর সেই বেল বাজানোতে কাজও করলো। ওইযে, দুই তলা থেকে মেয়েটা ইশারা দিচ্ছে। হাসি মাখা মুখ। হাতের পাঁচটা আঙ্গুল দেখিয়ে বুঝিয়ে দিল, আর মাত্র পাঁচ মিনিট সময় লাগবে। বিজয় সেদিকে কতক্ষন তাকিয়ে ছিল সেটা সে হিসাব করতে পারলো না।

সরি। অনেক দেরি হয়ে গেল। কিছু মনে করবেন না যেন। বিজয় দেখল, মিতু আজকেও শাড়ি পড়েছে। চুলগুলো খোলা। মিতুর সাথে আরেকটা মেয়ে। এটা মিতুর চাচাতো বোন। দেখতে প্রায় মিতুর মতোই। সেও সুন্দর করে শাড়ী পড়েছে। দুজন রিকসায় উঠে বসল। বিজয় রিকসা চালাতে আরাম্ব করল। মিতু মাঝে মাঝে বিজয়কে রাস্তা দেখিয়ে দিচ্ছে। আর টুকিটাকি কথা বলছে। বিজয় শুধু মাথা নাড়িয়ে যাচ্ছে।
মিতুর বোন মিতুকে ফিস ফিস করে বলল, এই ছেলেকে তুই চিনিস?
- চিনবো না কেন? অফিসে যাই রিকসায়।
- ছেলেটা দেখতে কিছু দারুন।
- ধুর। কী বলছিস এসব। পাগল কোথাকার।
কথাগুলো দুজনে পেছন থেকে ফিস ফিস করে বলছিলো। যাতে ছেলেটা শুনতে না পায়। তবে, বিজয় কথাটা স্পষ্টই শুনতে পেয়েছিলো। শরিরে যেন দ্রুত বিদ্যুৎ খেলে গেল। এই শীতের মধ্যেও যেন বিজয় ঘামছে। রিকসার গতি বাড়িয়ে দিল সে। রিকসার পেডেল ঠিকমতো করতে পারছে না সে। নাহ। যেভাবেই হোক শান্ত থাকার চেষ্টা করতে হবে।
সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। মিতু বলল, আরেকটু সময় লাগবে। বিজয় রিকসা চালিয়ে ক্লান্ত। এতোক্ষন সময় সে কখনোই আগে রিকসা চালায় নি। মেয়েটা একটা বাসার সামনে দাঁড়াতে বলল। হুম। বাসাটা ভালোই সাজানো হয়েছে। বিজয় বলল, কিসের অনুষ্ঠান এটা? মিতু বলল, বিয়ে। আমার খালাতো বোনের বিয়ে। এটা আমাদের খালার বাসা। ইচ্ছা ছিলো আজকে খালার বাসায় রাতে থেকে গিয়ে অনেক আনন্দ করবো। কিন্তু তেমনটা করা হচ্ছে না। কালকে সকালে অফিসে জরুরি একটা মিটিং রয়েছে। উপস্থিত থাকতেই হবে। তাই আনন্দটা একেবারে মাটি হয়ে গেল। ভেবেছি, আমি খেয়েদেয়ে সবার সাথে দেখা সাক্ষাত করে বাসায় চলে যাবো। তাই যদি কিছুটা সময় আমার জন্য অপেক্ষা করেন এখানে অনেক উপকার হতো। আমার সর্বোচ্চ দেড় ঘন্টার মতো লাগবে।

বিজয়ের শীত লাগছে প্রচন্ড। এই শীতে তার উচিত ছিলো বাসায় গিয়ে কম্বল গায়ে ঘুমানো। কিন্তু তা না করে বিজয় একটা মেয়ের জন্য এখানে শীতে কাঁপাকাঁপি করছে। বিজয়ের কল্পনা দুইটা অংশে ভাগ হয়ে গেল। একভাগ বলছে, চলে যেতে। এই শীতের কষ্ট সহ্য করে লাভটা কী? সামান্য একটা মেয়ের জন্য এতো কিছু করছিস? আরেক অংশ বলছে, মেয়েটা মোটেও সামান্য না। মেয়েটা তোর জন্য অনেক স্পেশাল। সে মেয়েটাকে তার ভালোবাসার কথা জানাবে। কিন্তু সেটা সময়ের অপেক্ষা।

রাত আটটা বাঁজে। বিজয় চায়ের দোকানে গিয়ে এক কাপ চা দিতে বলল। পকেট থেকে

ফোনটা বের করে তার বাবাকে ফোন দিল। ওপাশ থেকে বাবা বলল, কোথায় তুই?

- বাইরে আছি। আসতে একটু দেড়ি হবে। তুমি খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে যেও।

একটা ছেলে চা দিয়ে গেল। বিজয় চায়ে চুমুক দিল। পরিবেশটা দারুণ। চায়ের দোকানের টিভিতে একটা গান বেজে যাচ্ছে অনবরত। দোকানটাতে মানুষের ভির একটু বেশি হওয়ায় শীতটা একটু কম লাগছে। রাত বাড়ার সাথে সাথে ক্ষুধার পরিমানটাও বাড়ছে। পাশে একটা হোটেলও আছে। চায়ের দোকান থেকে উঠে সে হোটেলে চলে গেল। ভাত খেতে পারলে ভালো হবে। মেয়েটা যদি আবার এসে পরে? তবুও। কিছু খেতে হবে।

মেয়েটা রাত দশটার সময় বাসা থেকে বের হল। বিজয় খেয়েদেয়ে আবার সেই চায়ের দোকানেই বসেছিল। মেয়েটা রিকসার সামনে এসে বিজয়কে খুজতে লাগল। বিজয় চায়ের দোকান থেকে বের হয়ে মেয়েটাকে বলল, অবশেষে আসলেন তাহলে?

- সরি। এতো দেরি করার ইচ্ছা আমার ছিলো না। তবুও বিয়ে বাড়িতে গেলে তো হুট করে আসা যায় না। খাওয়াদাওয়া করলাম। তারপর বলল, কিছু ছবি তুলতে হবে। ফ্যামিলির সবাই ছিলো সেখানে। তাই অনেকটা দেরি হয়ে গেল।

- থাক সমস্যা নেই।

- আপনিও হয়তো ভিতরে ভিতরে আমার উপরে রাগ করছেন। একটা মেয়ের জন্য অনেক রাত পর্যন্ত জেগে আছেন।

- ধুর। কেবল রাত ১০ টা বাঁজে। এটা কোন রাত হল। এখন কথা বাদ দিয়ে রিকসায় উঠেন। আর আপনার বোন কোথায়?

- ও আজ রাতে থাকবে।

- ইচ্ছা করলে আপনিও তো থাকতে পারতেন। এখান থেকেই অফিসে যেতে পারতেন।

- বাবা মা বাসায় একা।

বিজয় রিকসা চালিয়ে যাচ্ছে। পরিবেশটা এখানে নীরব। এদিকে বাসাবাড়ি এবং লোকজন নেই বললেই চলে। একেবারে শুনশান। মাঝে মাঝে কিছু ঝি ঝি পোকা ডাকছে। রাস্তার এক পাশে অনেকগুলো পতিত জমি। সব মিলিয়ে জায়গাটা প্রায় ভৌতিক বললেই চলে।

- আপনার বাবা মাকে খুব ভালোবাসেন মনে হয় তাই না?

- যতটুকো পারি ভালো রাখার চেষ্টা করি। আর পারি কই। সারাদিন অফিসে থাকি। শুধু রাতে কথাবার্তা হয়।

- আপনি মেয়ে হয়ে বাবা মায়ের জন্য এতো কিছু করছেন এটাই অনেক কিছু। আচ্ছা। এতো রাতে আপনি একা। সাথে অচেনা একটা ছেলে। আপনার ভয় করছে না।

- ভয় করবে কেন? আমাকে দেখে কী ভীতু মেয়ে মনে হয়?

- সেটাই তো মনে হচ্ছে। এতো রাত। অন্ধকার। ভূতের ভয় পেতে পারেন।

- ভূত দেখেছেন কখনো?

- না।

- যেই জিনিস আমরা কখনো দেখি নি। সে জিনিস দেখে ভয় পাই কেন?

- আসলে ব্যাপারটা ছোটবেলায় আমাদের মনে গেঁথে দেওয়া হয়েছে যে ভূত একটা ভয়ঙ্কর

জিনিস। আমরা মনে মনে একটা ভয়ঙ্কর অবয়ব কল্পনা করে সেটা দেখে নিজে নিজেই ভয় পাই। অথচ আদৌ সেই জিনিস বাস্তবে নেই।

- মাঝে মাঝে আপনাকে দেখে রিকসাওয়ালা মনে হয় না। আপনি অনেক কিছু জানেন সেটা আপনার ভাষার প্রকাশ দেখে বোঝা যায়। আপনি একজন রিকশাচালক হয়েও দুনিয়ার অনেক খোঁজখবর রাখেন। ব্যাপারটা ভালো লাগলো।

জায়গাটা শহর থেকে অনেকটা দূরে। শীতের পরিমানটাও আস্তে আস্তে বাড়ছে। সাথে ঠান্ডা বাতাস। বাতাসের কারণে আজকে কুয়াশা অতোটা বোঁঝা যাচ্ছে না। আশেপাশটা দারুণ পরিস্কার। এমন সময় বিজয় সামনে দুইটা আলো দেখতে পেল। বিজয় এগিয়ে যাচ্ছে। আলোগুলোও সামনে আসছে। অইতো কয়েকটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। বিজয়ের রিকসা আরো এগিয়ে নিয়ে গেল। এবং তারা তাদের রিকসার দিকেই তাকিয়ে আছে। সাথে দুইটা মটরসাইকেল। মটরসাইকেলের হেডলাইটের আলো জ্বলছে। বিজয়ের ব্যাপারটা কেমন যেন সন্দেহ লাগতে লাগল। পেছন থেকে মেয়েটা বলে উঠলো, রিকসা দ্রত চালাবেন। ওনারা থামাতে বললেও থামাবেন না। বিজয় আগ্রহ নিয়ে প্রশ্ন করল, লোকগুলো কে? কিন্তু মেয়েটা এর উত্তর দিলো না। কেবল বলল, রিকসা দ্রুত চালান। থামবেন না। বিজয় রিকসার গতি বাড়িয়ে দিল। ছেলেগুলোর বয়স বেশি না। বিজয়ের বয়সেরই। রিকসাটা ছেলেগুলোর কাছে আসা মাত্রই বিজয় ছেলেগুলোকে খেয়াল করল, ছেলেগুলো মেয়েটার দিকে তাকিয়ে আছে। বিজয় রিকসার গতি বাড়িয়ে দিল। কয়েক মুহুর্তের মধ্যেই বিজয় ছেলেগুলোকে অতিক্রম করে চলে গেল। মেয়েটা পেছন থেকে আবার বলল, তারাতারি চলুন প্লিজ। জায়গাটা সুবিধের মনে হচ্ছে না। বিজয় বলল, চিন্তা করবেন না। আর বেশি সময় লাগবে না।
সেই মুহুর্তেই পেছন থেকে মটরসাইকেলের আওয়াজ আসতে লাগল। ছেলেগুলো রিকসাটার পিছু নিয়েছে। মটরসাইকেলের তুলনায় রিকসার গতি সামান্য থাকার কারণে, অল্প কিছুক্ষনের মধ্যেই ছেলেগুলো সেই রিকসার কাছে এসে পড়ল। বিজয় এদের পরিকল্পনা ঠিক বুঝতে পারল। সে রিকসা জোরে চালানোর চেষ্টা করল। ছেলেগুলো মটরসাইকেলের গতি আরো বাড়িয়ে দিল। তারপরেই একটা লম্বামতোন ছেলে মিতুকে বলল, মিতু! এতো রাতে আমি থাকতে এই ছেলের রিকসায় কী করছ? আমার গাড়িতে চলে এসো জান। ছেলেটার কথা শুনে মিতু কোন উত্তর দিল না। বিজয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, তারাতারি।
মটরসাইকেল আর রিকসা একই গতিতে চলছে। এই মিতু। আজকে তোমাকে অনেক হট লাগছে। চলোনা, আজকে রাতে যাই এক জায়গায়। অনেক মজা হবে। বিজয় এই কনকনে শীতের মধ্যেও ঘামছে। ক্রমেই ছেলেটার উৎপাত আরো বাড়তে লাগল। বিজয় সামনে থেকে কেবল সহ্য করে যাচ্ছিল। সহ্যের সীমা অতিক্রম করল তখনই যখন ছেলেটা মিতুর ওড়নাটা ধড়ে টান দিল।
বিজয় তার ডান পা দিয়ে মটরসাইকেলের সামনের অংশে জোড়ে একটা লাথি দিল। সাথে সাথে মটরসাইকেলের মধ্যে থাকা দুইজন নিয়ন্ত্রন হাড়িয়ে রাস্তার পড়ে গেল। বিজয় রিকসা থেকে নামল। ছেলেগুলো হাটুতে ব্যথা পেয়েছে নিশ্চই। বিজয় ছেলেটার কাছে গিয়ে ছেলেটার শার্টের কলার চেপে ধরে দাঁড় করালো। ঠাস ঠাক করে ডান গালে দুইটা চড় বসিয়ে দিয়ে বলল, রাস্তায় মেয়ে দেখলে নিজেকে কন্ট্রোলে রাখতে পারিস না।

আরেকটা মটরসাইকেলে আরো দুইজন ছিল। ওরা মটরসাইকেল থামিয়ে বিজয়ের কাছে এসে বলল, সমস্যা কি আপনার? শরিরে বেশি চর্বি হইছে? ছেলেটা আচমকা বিজয়ের নাকের মধ্যে একটা ঘুষি দিয়ে বসল। এই ঘুষির জন্য সে মোটেও প্রস্তত ছিলো না। বিজয় সাথে সাথে ছেলেটার কলার ধরে নাকের মধ্যে দুইটা ঘুষি দিল। সাথে সাথে আরেকটা ছেলে এসে বিজয়কে পেছন দিক থেকে চেপে ধরার চেষ্টা করল। কিন্তু বিজয় নিজের কুনুই দিকে ছেলেটার পেটের মধ্যে আঘাত করল। ছেলেটা সাথে সাথে দু হাত দুড়ে ছিটকে চলে গেল। একজনের নাক দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে। আরেকজন পেটে আঘাত পেয়ে সেখানেই শুয়ে পড়ল। বিজয় লম্বামতোন ছেলেটার কাছে গিয়ে পুনারায় কলার ধরে বলল, কী? মেয়ে দেখলে হুস থাকে না? বল সালা। তোদের জন্য এখন মেয়েরা রাস্তায় বের হতে ভয় পায়। আজকে তোর এমন অবস্থা করবো তুই আজ থেকে মেয়েদের দিকে তাকালেই লজ্জা পাবি। বিজয় ছেলেটার চুলের মুঠি ধরে দুই গালে মারতে মারতে লাল বানিয়ে ফেলল। নাকে মুখে কয়েকটা ঘুষি দিল। ঠোট ফেঁটে র*ক্ত আসতে লাগল। তবুও বিজয় থামছে না। মেরে ফেলতে ইচ্ছে করছে ছেলেটাকে। ছেলেটা একসময় নিস্তেজ হয়ে রাস্তায় শুয়ে পড়ল।
এই প্রথম মেয়েটা বিজয়ের হাত ধরে টান দিয়ে বলল, হয়েছে। মরে যাবে, আসুন তো। বিজয় খানিকটা শান্ত হল। মিতু এখনো ভয় পাচ্ছে। তার ঠোট কাঁপছে।
বিজয় বলল, ভয় পাবেন না। ওরা শিক্ষা পেয়েছে। আর এমন করবে না। আপনি কি এদের আগে থেকেই চেনেন?
মিতু মাথা ঝাকিয়ে বলল, হুম। মাঝে মাঝেই বিরক্ত করে। বাসায়ও আসার চেষ্টা করে। বাবাকে হুমকি দেয় আমার সাথে বিয়ের জন্য। আমি ওকে বিয়ে করবো না। তারপরেও বার বার বিরক্ত করার জন্য আসে।
- আবার আসলে জানাবেন আমাকে। এখন চলুন।
দুজনেই রিকসায় উঠে বসল। রিকসা চালাতে আরাম্ব করল বিজয়। অনেক রাত হয়ে গেছে। রিকসার মালিক আজকে নিশ্চই জরিমানা রাখবে। এদিকে বিজয়ের বাবাও ঘুমিয়ে গেছে হয়তো।
"আজকে আপনি না থাকলে আমার অনেক খারাপ কিছু হয়ে যেতে পারতো জানেন সেটা?"
বিজয় এর কোন উত্তর দিলো না। মেয়েটা আবার বলল, থ্যাংকস। শুধু থ্যাংকস দিলে ভুল হবে।
- তাহলে আর কী দিতে চান?
- আমার তো দেওয়ার মতো কিছু নেই। কিন্তু আপনার কথা আমার সারা জীবন মনে থাকবে।
- আপনি বিপদে আছেন। আপনাকে সাহাজ্য করা আমার দায়িত্ব।

আরো কিছুক্ষন রিকসা চালানোর পর অবশেষে মেয়েটার বাসায় আসলো বিজয়। মেয়েটা রিকসা থেকে নেমে ভাড়া দিল। দেওয়ার সময় বলল, আপনাকে যত টাকাই দেই না কেন। সেটা কম হয়ে যাচ্ছে।
- ধুর। কী বলছেন এসব? আপনার এতো কিছু ভাবার দরকার নেই। যান। বাসায় যান অনেক রাত হয়ে গেছে।
মেয়েটা বাসায় যাওয়ার আগে বিজয়ের মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকাল। মেয়েটা বিজয়ের

মুখের কাছে গেল। "আপনার নাক দিয়ে র*ক্ত বের হচ্ছে"। আমি একদম খেয়াল করি নি। ব্যথা পেয়েছেন নিশ্চই? মেয়েটা অনেকটা অনেকটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল।
বিজয় বলল, আপনি চিন্তা করবেন না। বেশি ব্যথা পাই নি। ফার্মেসি থেকে অসুধ নিয়ে নিব। কিন্তু বিজয় একসময় খেয়াল করল মিতুর চোখে পানি চলে এসেছে। সে নিজের ব্যাগ থেকে টিস্যু বের করে নিজের হাত দিয়ে তার নাকের র*ক্তটা মুছে দিল। বিজয় কিছুক্ষনের জন্য থ হয়ে রইল। মেয়েটা একসময় বলল, আমাকে মাফ করে দিয়েন। এসব কিছু আমার জন্যই হয়েছে।
- আপনি অনেক বেশি চিন্তা করছেন। যান। এখন ঘড়ে যান। আপনার বাবা মা অপেক্ষা করছে হয়তো।
মেয়েটা চলে গেল। রাত বারোটা ছুই ছুই। বারোটার পরে রিকসা নিয়ে গেলে জরিমানা নিবে অবশ্যই। কিন্তু কী আর করার।

মিতু

আজকে মিতুর উঠতে অনেকটা দেড়ি হয়ে গেল। কালকে রাতে ঘুমাতে ঘুমাতে প্রায় ১ টা বেজে গেছিল। ঘুম ভাঙতেই ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সে অবাক হয়ে গেল। অফিসের বেশি সময় নেই। তারাতারি ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ হয়ে হালকা একটু নাস্তা সেরে নিল। মিতুর মা সকালবেলা উঠে মেয়ের জন্য রান্না করে। মিতু আজকে কোনরকম খেয়ে রেডি হয়ে অফিসে চলে গেল। আজকে অফিসে একটা মিটিং আছে। উচিৎ ছিল একটু পরিপাটি হয়ে যাওয়া। কিন্তু পরিপাটি হতে গিয়ে দেরি হয়ে গেলে আরো ঝামেলা হয়ে যাবে। যাওয়ার আগে মাকে বলল, আসার সময় কিছু আনতে হবে? মিতুর মা মেয়েকে বলল, তরকারি একদম নেই। কিছু সবজি আনতে পারবি?
আচ্ছা বলে মিতু বাসা থেকে বের হয়ে গেল। বাসা থেকে বাজারে ৫ মিনিটের জন্য হেঁটে যায় সে। তারপর অফিস পর্যন্ত রিকসা নিতে হয়। আজকে কী ছেলেটা আসবে? কালকে ছেলেটার উপর দিয়ে অনেক ধকল গেছে। আজকে নাও আসতে পারে। নাকে ব্যথা পেয়েছে। যেতে যেতে কালকের ঘটনাগুলো মনে পড়তে লাগল। ছেলেটার অনেক সাহস। কিভাবে ছেলেগুলোকে মারল। মনে হয়না আর অই ছেলেগুলো রাস্তায় বিরক্ত করতে আসবে। ইদানিং মিতু ছেলেটার কথা একটু বেশিই ভাবছে। তাঁর কথা বলার স্টাইল, ছেলেটার হেয়ার কাট, দাড়ি শেভ করার স্টাইল দেখে মনে হয় না সে একজন রিকশাচালক। অন্যান্য চালকদের মতো করে সে রিকসা চালায় না। চালানোর গতি ধীর। যেন রিকসা চালানোতে ছেলেটা অপরিপক্ক। এক কথায় বলতে গেলে নিশ্চই একটা রহস্য আছে। কিন্তু মিতু সেটা ধরতে পারছে না।

বাজারের পৌঁছাল মিতু। একটু খোজার চেষ্টা করল ছেলেটাকে। এসেছে কি? আজ থেকে মনে হয় আর আসবে না। মিতুর কেন জানি খারাপ লাগতে লাগল। খারাপ লাগছে কেন? আশেপাশে কয়েকটা রিকসাও দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সে উঠছে না। সে বিশেষ অই রিকসাটার অপেক্ষাতেই আছে। এমনিতে আজকে অফিসে দেড়ি হয়ে যাচ্ছে। উচিৎ অন্য কোন রিকসাতে উঠে পড়া। মিতুর ইচ্ছে করছে না। তাঁর মনটা আজ কিসের জন্য যেন অনেকটা খারাপ হয়ে গেল। মনের মধ্যে যেন কালো মেঘে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। কিন্তু এমন লাগার কারণ মিতু বের করতে পারলো না।
আর কিছুক্ষন পরে মিতু খেয়াল করল, ছেলেটা আসছে। ওইতো। তাকেই খুঁজছে। মেঘের আড়াল থেকে যেন রোদের দেখা পাওয়া গেল। মিতু ছেলেটার রিকসার কাছে গেল। আজকে নতুন করে মিতু বলল, যাবেন?
বিজয় হাঁসি মুখেই বলল, আপনার জন্যই তো আসি। জানেন না সেটা?
মিতু আর কথা না বাড়িয়ে রিকসায় উঠে বসল। বলল, তারাতারি যেতে হবে আজকে। অফিসের অনেক দেড়ি হয়ে গেছে।
হুম, আজকে আমিও অনেক দেড়ি করে ফেলেছি। ভেবেছিলাম আপনি অন্য কোন রিকসায়

চলে গেছেন। কিন্তু এখানে এসে দেখলাম ব্যাপারটা উলটা। আপনি এখনো আমার জন্য অপেক্ষা করছেন।
- হয়েছে। তারাতারি চালান। আজকে দেরি হলে খবর আছে।
বিজয় দ্রুত রিকসা চালিয়ে যাচ্ছে। মিতু ছেলেটার দিকে তাকিয়ে আছে। ছেলেটা একটা শার্ট পরেছে। মুখে মাক্স পরা। মিতু নিরবতা ভেঙ্গে ছেলেটাকে প্রশ্ন করল, আপনাকে কিছুদিন সারাক্ষন মাক্স পরে থাকতে দেখছি। কারণটা একটু বলবেন?
- ওইতো রাস্তার ধুলোবালি থেকে বেঁচে থাকার জন্যই।
- ধুলোবালি? আমাদের এই এলাকায় আপনি ধুলোবালি পেলেন কোথায়? রাস্তা তো এক্কেবারে পরিস্কার।
বিজয় এরকম কথা আগে ভেবে দেখে নি। রাস্তায় ধুলোবালি আসলেই অনেকটা কম। বিজয় বলল, মাক্স পড়াটাই ভালো। ধুলোবালি না থাকলে কী হবে। ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া যে নেই, সেই কথা তো বলা যায় না।
- হয়েছে হয়েছে। তারাতারি চালান। আজকে অফিসে গেলে কী যে হবে আল্লাহ ভালো জানে।

অফিসের সামনে রিকসা এসে থামলো। মিতু নিজের ব্যাগ থেকে টাকা বের করে বিজয়ের কাছে দিতেই বিজয় বলল, থাক। আপনার কাছ থেকে আর টাকা নিবো না। কথাটা শুনে মিতু যেন আকাশ থেকে পড়ল। তারপর বলল, বলেন কী? আমার থেকে টাকা নিবেন না মানে?
- আপনি আমার অনেক দিনের পরিচিত। আপনার কাছ থেকে টাকা নেওয়াটা আমার ভালো লাগছে না।
- বাব্বা। অফিসের অনেক দেড়ি হয়ে যাচ্ছে। আপনার মুখের মধুর কথা এখন শুনতে ইচ্ছে করছে না। টাকাটা রাখুন।
- না। আমি রাখতে পারবো না।
মিতু বিরক্ত হয়ে বলল, আচ্ছা বাই। পরে দেখা হবে।
মিতু অফিসে চলে আসলো। আজকে একটু বেশিই দেরি হয়ে গেল। অফিসে আসার পর মিতু জানতে পারল, অস্ট্রেলিয়া থেকে যে ক্লায়েন্ট আসার কথা, আজকে সে কোন এক কারণে আসতে পারে নি। তাই মিটিংটা কিছুদিনের জন্য পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। কথাটা জানতে পেরে তাঁর মাথা থেকে যেন হাজার টন পাথর সরে গেল। আজকে মিতু চেহাড়ার যে অবস্থা করে এসেছে, এতে অফিসের বস যে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিবে না এটাই অনেক। অফিসে মিতুর প্রিয় বান্ধবী রাইসা। মিতুর পাশে এসে বসল কিছুক্ষন। তারপর বলল, কীরে। এতো সুন্দরী মেয়ের চোখের নিচে এতো কালো দাগ কেন রে? রাতে ঘুমাস নি?
- নারে। রাতে ঘুমাতে পারি নি। বোনের বিয়েতে গিয়েছিলাম। অফিসে মিটিংয়ের কথা শুনে রাতেই এসে পড়তে হলো। বাসায় আসতে আসতে রাত বারোটা। যদি আগে জানতাম মিটিং ক্যানসেল। তাহলে আজকে ছুটিই নিয়ে নিতাম।
- তোর সব কাজিনদের তো বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। এদিকে তুই কিন্তু সেই আগের মতোই রয়ে গেলি। কিরে, বিয়ে শাদী করবি না?
- কিছুদিন ধরে তুই বড্ড বেড়েছিস কিন্তু। আমাকে নিয়ে তোর নাক গলাতে হবে না। তুই নিজের চরকায় তেল দে।

- দিচ্ছি তো। অন্যদের চরকায় তেল কেন দিতে যাবো। তেলের দাম নেই বুঝি। বাই দ্যা ওয়ে, আমি কিছুদিন ধরে একটা জিনিস খেয়াল করছি। অনুমতি দিলে বলবো।
- বল।
- কিছুদিন ধরে দেখছি তুই একটা ছেলের রিকসায় করে নিয়মিত আসছিস। কে ছেলেটা? তোর বয়ফ্রেন্ড নাকি? রিকসায় করে নিয়ে আসে?
- ধুর, এসব কেন হতে যাবে। এদিকেই রিকসা নিয়ে আসে। তাই আমাকে নিয়ে আসে।
- তোকেই কেন প্রতিদিন নিয়ে আসে। আর কাউকে না নিয়ে। ব্যাপারটা আমার কাছে ভালো লাগছে না কিন্তু।
- বা.. রে। এখানে তোর খারাপ লাগার কী আছে। কিছুদিন ধরে আসার কারণে পরিচয় হয়েছে। তাই প্রতিদিন আসি।
- হয়েছে, বুঝেছি। তবে ছেলেটা কিন্তু দারুন। দেখে রিকসাচালক মনে হয় না। আমি বিয়ে না করলে ছেলেটাকে গিয়ে প্রপোজ করতাম।

সন্ধ্যায় মিতু কিছু বাজার করে বাসায় আসলো। এসে গোছল করে নিল। তারপর কিছুক্ষন বই নিয়ে বসল। আজকে বই নিয়ে বসতে অনেক ইচ্ছে হল। অনেক দিন ধরে বসা হয় না। পড়তে ভালো লাগে না। আগে ভালো লাগতো। যখন তার ভাই বেঁচে ছিলো। হিমু, মিসির আলীর সাথে ছিলো তার গভীর পরিচয়। ঘড়ের কোণায় এখনো অনেক বই পরে আছে যেগুলা এখনো পড়া হয় নি।
- মিতু, ভাত খাবি না?
- খাবো মা। আসছি।
বইটা রেখে দিল। খাবার টেবিলে গিয়ে মাকে বলল, বাবা খাবে না? বাবা কই?
- তোর বাবা আর কই থাকবে। শুয়ে আছে বিছানায়।
মিতু রাগ দেখিয়ে বলল, বাবাকে কতো বলেছি সন্ধ্যাবেলায় শুয়ে না থেকে একটু হাঁটাহাটি করুক। এটা কী শুয়ে থাকার সময়?
- সেটা তোর বাবাকে গিয়ে বল। আমাকে বলছিস কেন?
মিতু বাবার রুমে গিয়ে তার বাবাকে বলল, তুমি আমার কথা শুনবে না বাবা তাই তো? তোমাকে না বলেছি, সন্ধ্যাবেলা শুয়ে থাকবে না। ইচ্ছা হলে বাইরে গিয়ে একটু ঘুড়ে আসবে। শরিরটা ভালো থাকবে।
- শরীর ভালো দিয়ে আর কি করবো রে। বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। শরীর তো এমনিতেই খারাপ হবে।
- তুমি একটা পাগোল। তুমি নিজে যদি মনে মনে ভাবো যে তুমি বুড়ো হয়ে যাচ্ছে তাহলে তুমি শীগ্রই বুড়ো হয়ে যাবে। আমরা মনে মনে নিজেকে যা ভাবি আমাদের শরীর তাই করার চেষ্টা করে।
মিতুর বাবা হেঁসে বলল, জানতাম না যে আমাদের ঘড়ে একটা বড় বিজ্ঞানী আছে।
- হয়েছে। আসো ভাত খাবো।
- তোর তো ইচ্ছা ছিলো বড় একজন ডাক্তার হবি। আমারদেরই ভুল ছিলো। তোকে ডাক্তারি পড়ালে ভালো হতো। আমার মনে হয় এতোদিনে তুই একটা বড় ডাক্তার হতে পারতি।
- হয়েছে বাবা। এসব নিয়ে কেন ভাবো। খোদা যা করে ভালোর জন্যই করে। জানো না এটা?

- জানি তো। আয়। ভাত খাই চল।

খেয়েদেয়ে ঘুমাতে যায় মিতু। বইগুলো আর পড়া হয় না। ঘুমানোর আগে বিজয় ছেলেটার কথা হঠাৎ করে মনে পড়ল। ছেলেটা স্মার্ট। তাহলে রিকসা চালাচ্ছে কেন? ছেলেটার কথা বলায় বোঝা যায় সে শিক্ষিত। তাহলে চাকরি না করে রিকসা চালানোর কারণ কি? মিতু এই হিসাবটা মিলাতে পারছে না। সেদিন রাতের কথা মনে পড়ছে অনেক। ওরকম কয়েকটা ছেলের সাথে একাই লড়ছিলো। নিশ্চই সে সাহসী। মিতুর অজান্তেই তার অন্তরে ছেলেটার জন্য একটা জায়গা হয়ে যাচ্ছে তা মিতু একটু একটু আন্দাজ করতে পারল। ইদানিং মাঝে মাঝেই চোখের সামনে সেই অচেনা ছেলেটার ছবি ভেসে আসছে। মিতু পরদিন তার সাথে কী কী আলোচনা করবে তা আগে থেকেই ভেবে রেখে দিচ্ছে। অনেক কথা ভাবে। কিন্তু সবগুলো আর মনে করে বলা হয় না। মিতু ঘুমিয়ে পড়ে। পরদিন আবার সকাল হয়। আবার অফিসে যায় এবং আবার তাদের দেখা হয়। অনেক আলাপ। মিতু হেসে হেসে কথা বলে। যেন তারা অনেক দিনের পরিচিত কোন বন্ধু। অনেক দিনের সম্পর্ক তাদের।

আজকে শুক্রবার। মিতু রাস্তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। কেবল সকাল নয়টা বাজে। রিকসার ক্রিং ক্রিং শব্দে মিতু স্তম্ভিত ফিরে পেল। ছেলেটা এসেছে।
- "আজকে শুক্রবার, তবুও আসতে বলেছিলেন যে।"
মিতু বলল, আপনাকে নিয়ে আজকে একটা জায়গায় যাবো। চলেন।
মিতু রিকসায় উঠে বসল। তারপর বিজয়কে বলল, চলুন।

সামনে বিশাল বড় একটা লেক। চারদিকটা সবুজ। লেকের পানি টলটলে। সবুজ প্রকৃতির স্পর্শ পেয়ে পানিও সবুজ রঙ ধারণ করেছে। একটা বেঞ্চের মধ্যে গিয়ে মিতু বসল। বিজয় এতোক্ষন মিতুকে অনুসরণ করে আসছিলো। মিতুর কাছে আসার পরে সে বলল, বসুন। বিজয় মিতুর পাশে অনেকটা দুরত্ব নিয়ে বসল।
মিতু বলল, জায়গাটা কেমন?
- দারুন। কতো সুন্দর প্রকৃতি। এমন জায়গায় খুব কম আসা হয়। আজকে আপনার জন্য আসতে পারলাম।
- এখানে কেন এসেছি জানেন?
- কেন?
- জায়গাটা আমার অনেক ভালো লাগে। যদি কখনো সময় পাই তাহলে এখানে চলে আসি। কতো সুন্দর ঠান্ডা বাতাস দেখেছেন?
- হুম। অনেক সুন্দর। তো আজকে আপনার সাথে আমাকে আনার কারণ কী?
মিতু কিছুক্ষনের জন্য হাঁসল। তারপর বলল, কিছু কথা ছিলো আপনার সাথে। বিজয় অবাক হয়ে বলল, কিসের কথা?
মিতু বলল, এইতো টুকিটাকি কিছু কথা।
- আচ্ছা। চেষ্টা করবো উত্তর দেওয়ার।
- কফি খাবেন?

- আপনার ইচ্ছা।
- তাহলে যান। ওই দোকান থেকে দুই কাপ কফি আনেন। আমার জন্য আর আপনার জন্য একটা। বিজয় চায়ের জন্য উঠল। পাশ থেকে মিতু বলল, আমার থেকে টাকা নিয়ে যান। বিজয় বলল, লাগবে না। কফির টাকাটা অন্তত আমি দিতে পারবো।

কফি খেতে খেতে মিতু বলল, আপনি লেখাপড়া কতদুর করেছেন?
- করেছি কিছু কিছু। গরীব মানুষ তো।
- আপনি মিথ্যা বলছেন। আমি কিন্তু বুঝতে পারছি।
- বুঝতে পারলে ভালো।
- মানে? আপনি আমাকে সত্য বলবেন না?
- এতো কথা বাদ দিন তো। আমি রিকসা চালাই। আমার জীবন নিয়ে আপনার এতো চিন্তাভাবনা কেন সেটাই বুঝতে পারছি না।
- তার মানে আপনি আমাকে বলতে চান না?
- ব্যাপারটা তেমন না। আমার জীবন নিয়ে কী আর বলার আছে।
- থাক। বলতে হবে না। চললাম। ভালো থাকেন।
মিতু কফির কাপটা পাশে রেখেই চলে যেতে আরাম্ব করল। বিজয়ের দিকে ঘুড়েও তাকালো না। মিতু রাস্তার কাছে গেল। পাশেই বিজয়ের রিকসা থাকা সত্যেও মিতু অন্য একটা রিকসা ভাড়া করে চলে গেল। বিজয় সেটা অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। কফিটা অর্ধেক খাওয়া হয়েছে। বাকিটুকু কোনভাবেই খেতে ইচ্ছে করলো না বিজয়ের। ফেলে দিল।

বাসায় এসে মিতুর মনটা খারাপ হয়ে গেল। আজকে ছুটির দিন। ইচ্ছা ছিলো কিছু কাজ করবে। কাজের লিস্টটা অনেক বড়। কিন্তু এই মুহুর্তে কোন কাজ করতে ইচ্ছে করছে না। এসেই বিছানায় শুয়ে পড়ল। মিতুর মা এসে বলল, কোথায় গেছিলি? এসেই শুয়ে পড়লি যে? মিতু শুয়ে থেকেই বলল, ভালো লাগছে না মা।
- কী হয়েছে বল তো?
- শরীরটা খুব খারাপ লাগছে। একটু ঘুমাবো।
- সকালে কিন্তু কিছু খেয়ে যাস কি। কিছু খাবি না।
- না।
মিতুর মা মেয়ের এমনটা দেখে একটু ভয় পেয়ে গেল। তার মেয়ে তো কখনো এভাবে এসেই শুয়ে পড়ে না। তবে মাঝে মাঝে, যখন মনটা অনেক খারাপ হয়ে থাকে। তার মা বোঝে এটা মন খারাপের শুয়ে থাকা। তবুও সে মিতুকে কিছু বলে না। ইদানিং মিতুকে কিছু বলাও যায় না। সে বড় হয়ে গেছে। তার মা খেয়াল করে তার মেয়ে অনেক বড় হয়ে গেছে। এই কিছু দিন আগেও মিতু নামের মেয়েটা অনেক হাসিখুশি ছিলো। যখন তার ভাই বেঁচে ছিলো তখন তো সে এক্কেবারে বাচ্চাই ছিলো। সারাদিন বই পড়া, টিভিতে গোপাল ভাড় দেখা, এগুলাই ছিলো প্রতিদিনের রুটিন। তার ভাই ভার্সিটির টপ স্টুডেন্ট। এদিকে মিতুর অবস্থা মোটামুটি। মায়ের কাছে সারাক্ষন বকা খেতো মিতু। বলত, তুই নাকি ডাক্তার হতে চাস। বলি, এই মাথা নিয়ে তুই মেডিকেলে চান্স পাবি? পরিক্ষাই দিতে পারবি কিনা সন্দেহ। এদিকে মিতু কোন ভ্রুক্ষেপ করে

না। সে ডাক্তার হতে চায়। তবে ডাক্তার না হতে পারলে যে জীবনটা নষ্ট হয়ে যাবে তেমনটা সে ভাবে না। মিতুর বাবা বলে, ওকে একটু আনন্দেই থাকতে দাও না। বিয়ে হয়ে গেলে কি আর এভাবে ছেলেমানুষি করতে পারবে? মেয়ে বড় হবে না?
একদিন তাঁর ভাইয়ের চাকরী হয়ে গেল। কী খুশী সবাই। মিতু ভাবল, যাক এবার মনের কিছু আশা পুর্ণ হবে। বাবা মা দুজনে তো অনেক খুশি। বিশেষ করে তার বাবা। জীবনে অনেক পরিশ্রম করেছেন তিনি। এখন সে হাঁপিয়ে গেছে। আগের মতো শক্তি আর নেই তার।
তবে বাবার হাঁসি বেশিদিন থাকলো না। চাকরী হওয়ার ১৭ দিনের মাথায় ভাই অনেক বড় একটা গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা গেল। তার বাবা এই কথা কোনভাবে বিশ্বাসই করতে পারছিলো না। তিনিও মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে গেলেন। মা-ও ভেঙে পড়লেন। মিতুও বুঝতে পারছিলো না যে কোথা থেকে কী হয়ে গেল। সেদিনের পর থেকে আর টিভিতে কার্টুন দেখা হয় নি। ছেলেমানুষি আচরণ সেদিনের পর থেকে চিরোদিনের জন্য বিদায় হয়েছিল তার জীবন থেকে। বই পড়া থেকে মনোযোগ সরিয়ে সে মনোযোগ দিল নিজের ক্যারিয়ারের দিকে। মিতুর লেখাপড়া কম। কোন চাকরি পাওয়াটা তার জন্য অনেক কঠিন। মিতুদের সংসারে যখন পুনারায় অভাব দেখা গেল তখন মিতুর এক বান্ধবী বলল, আমাদের কম্পানিতে কিছু গ্রাফিক্স ডিজাইনার নেওয়া হবে। তোর তো কাজ জানা নেই। তুই তিন মাসের একটা কোর্স করে নে। তারপর আমি বসকে বলে তোকে একটা চাকরির ব্যাবস্থা করে দিতে পারবো। সেই থেকে মিতুর জীবনটা পুরোপুরিভাবে পালটে গেল। মিতু ৩ মাসে গ্রাফিক্স ডিজাইনের একটা কোর্স শিখল। তারপর তার বান্ধবী কম্পানির বসকে বলে একটা চাকরির ব্যাবস্থা করে দিল। চাকরিটা পাওয়ার পর থেকে সে অনেক বড় হয়ে গেছে। তার চেহাড়া থেকে ছেলেমানুষি ভাবটা চলে গেল। মিতু নামের মেয়েটা অনেক বড় হয়ে গেছে এখন। কতদিন ধরে যে টিভিটা চালু করে না সে, সেটা মনেই নেই। বইগুলোও আর ভালোভাবে পড়া হয় না।

অফিসের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে মিতু। মাকে বিদায় জানিয়ে রওনা হলো সে। আজকে শীতটা একটু কমই পরেছে। আজকে বাজারে আসার পর মিতু আশেপাশে তাকিয়ে দেখল। তারপর দেখল বিজয় ছেলেটা রিকসা নিয়ে এসেছে। ছেলেটা তার দিকে তাকিয়ে আছে। মিতু একটু এগিয়ে গেল। ছেলেটা মিতুকে দেখে হাত দিয়ে ইশারা করল। তারপর মিতু যেটা করল সেটা দেখার জন্য বিজয় মোটেও প্রস্তুত ছিলো না। মিতু তার পাশে থাকা একটা রিকসাওয়ালাকে বলল, যাবেন? শ্যামপুর রেলগেট?
মিতু অন্য একটা রিকসায় উঠে বসল। বিজয় অবাক হয়ে রিকসাটার দিকে তাকিয়ে রইল। মিতু যেন তাকে দেখেও না দেখার ভান করে চলে গেল।
মিতু পেছনের দিকে একটিবারের জন্যও তাকাল না। অথচ বিজয় রিকসাটার পিছু করতে লাগল। পেছন থেকে বার বার রিকসার ক্রিং ক্রিং শব্দ কানে আসতে লাগল। তবুও মিতু তাকাচ্ছে না। একসময় রেলগেটের সামনে এসে থামলো রিকসাটা। মিতু রিকসা থেকে নেমে ভাড়া দিয়ে চলে গেল। বিজয়ও রিকসা থামালো। মিতুর দিকে তাকিয়ে রইলো অনেকক্ষন। মিতু জানে ছেলেটা তাকে ফলো করছে। কিন্তু তারপরেও সে ছেলেটার দিকে তাকালো না। এক্কেবারে সোজা অফিসে ঢুকে গেল।

"কীরে। আজকে ঠিক আছিস তো" রাইসা মিতুর দিকে ঝুকে বলল। মিতু বলল, হ্যা। ঠিক আছি। কেন রে, কী হয়েছে?
- আজকে দেখলাম অন্য একটা রিকসায় আসলি।
- এই। তোর কি সবসময়ই আমাকে নিয়ে গবেষনা করতে ভালো লাগে?
- ছেলেটা যে তোর পেছন পেছন আসলো? সেটার উত্তর কিভাবে দিবি?
- সর তো। আমাকে বিরক্ত করিস না। অনেকগুলা কাজ জমে আছে। এসব বলে আমার মাথাটা নষ্ট করিস না।
- ছেলেটা যে তোকে পছন্দ করে সেটা কিন্তু শিউর হয়ে গেলাম আমি।
- উফ। যাবি আমার এখান থেকে?
- আচ্ছা বাবা। আমি গেলাম। ভালোমতে কাজ কর। বাই।

অনেক কাজ মিতুর। তার উচিৎ ছিলো কাজগুলো কমপ্লিট করা। তবে একটু পরে বুঝতে পারল মিতু কোন কাজেই মনোযোগ দিতে পারছে না। মাথার মধ্যে ছেলেটার চিন্তা ঘুরপাক খেতে লাগল। তারমানে আসলেই ছেলেটা তাকে পছন্দ করে? নাহলে রিকসা নিয়ে এতো দূর ফলো করার কারণ কী? সত্যি সেদিন মিতু ভালোভাবে কাজ করতে পারলো না। মজার ব্যাপার কোন কারণ ছাড়াই তার হাত কাঁপছে। বুকের হার্টবিট বাড়ছে। তারমানে সেও সেই ছেলের মায়াজালে বন্ধি হয়ে যাচ্ছে। একটা রিকসাওয়ালা ছেলের প্রেমে পড়ছে সে। না। এভাবে কল্পনা করতে পারছে না সে। কিছুই ভালো লাগছে না আজকে। গলা শুকিয়ে যাচ্ছে বার বার।
অফিস থেকে এসে মিতু ফ্রেশ হয়ে কিছু খেয়ে নিল। তারপর অনেক দিন পর আজকে সে টিভিটা চালু করল। অনেক দিন ধরে টিভি দেখা হয় না। এই কদিনে অনেকগুলো নতুন চ্যানেল এসেছে হয়তো। ভাবলো আজকে কার্টুন দেখবে। হ্যা। তাই করলো সে। একটা কার্টুনের চ্যানেল দিল। মা অবাক হয়ে মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, আজকে তোকে অন্য রকম লাগছে। এসেই তো কখনো টিভি দেখতে দেখি না। ভালো কোন শো আছে নাকি রে?
- হ্যা। আছে তো। দেখো। এটা কী কার্টুন? শার্কো?
- তারমানে তুই এখনো বড় হোস নি? আজকে থেকে বাচ্চাদের মতোন আবার কার্টুন দেখা শুরু করলি?
অন্য রুম থেকে মিতুর বাবা এসে বলল, তুমি চাও আমার মেয়ে এখনি আমাদের মতো বুড়ো হয়ে যাক? তেমনটা হবে না। আমার মেয়ে সারাজীবন আমার মেয়ের মতোই থাকবে। পিচ্চি। ছোট্ট। তা কী দেখছিস?
মিতুর বাবা মিতুর কাছে এসে বসলো। তারপর বলল, মিতুর মা। আমাদের তিনজনের জন্য তিন কাপ চা বানিয়ে আনো তো। আর মেয়েরটায় চিনি বেশি দিও।

ইউ-টার্ন

প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে মুখটা ধুয়ে বারান্দায় বসে চা খান বিজয়ের বাবা একরাম হোসেন। এটা তার অভ্যাস। চা-টা খেয়ে তিনি গোছলে যাবেন। তারপর গোছল করে নিজে কিছু রান্নাবান্না করেন। বিজয় তাকে অনেকবার বলেছে, একটা কাজের লোক রেখে নিতে। কিন্তু একরাম হোসেন সেটা করবেন না। তার মতে এটা একটা বাড়তি ঝামেলা। নিজে একা একা রান্না করে খায় এটাই তার কাছে অনেক ভালো লাগে। বিজয় কিছু বললে একরাম হোসেন বলবেন, সারা জীবন তোকে রান্না করে খিলিয়েছে কে? বিজয় এর কোন উত্তর দেয় না।
চা খেয়ে কাপটা বেসিনে ধুয়ে নেয়। তারপর লুঙ্গি আর গামছা নিয়ে ওয়াশরুমে ঢুকার সময় বিজয় পেছন থেকে এসে বলে, বাবা আমি বের হলাম। একরাম হোসেন ছেলেকে আর কিছু বলে না। শুধু বলে, যা। বিজয় চলে যায়। সে বাথরুমে ঢুকে। তারপর গোছল সেরে নাস্তা তৈরি করে কিছু খেয়ে নেয়। তারপর রেড়ি হয় স্কুলের জন্য।

সে স্কুলে বাচ্চাদের ইংলিশ ক্লাশ নেয়। কারণ সে খুব ভালোভাবে গ্রামার বুঝাতে পারে। অল্পদিনের মধ্যে সে বাচ্চাদের এবং অভিভাবকদের কাছে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন। কিছুদিন পড়ানোর পর অনেক অভিভাবকরা ফোন দিতে লাগলে, আমার ছেলেকে টিউশনি করাতে হবে। ভালো টাকার অফার। কিন্তু তার তাতে ইচ্ছা নেই। কোন টিউশনি নেন নি। একরাম হোসেন মনে মনে ভাবেন, এখানে তিনি টাকার জন্য পড়ান না। তার কাছে যথেষ্ট টাকাপয়সা আছে। যেটা নেই, সেটা হচ্ছে ভালোবাসা। বিজয় চলে গেলেই তিনি একা হয়ে যান। কোথাও তার ভালো লাগে না। তাই সে কিছুটা সময় বাচ্চাদের সাথে কাঁটান। এই কারণ ছাড়া তার অন্য কোন কারণ নেই। পড়াতে তার ভালো লাগে। কাউকে একটা নতুন কিছু শেখাতে পারলে মনের ভিতর শান্তি লাগে।

ঝকঝকে রোদ আশেপাশে। একরাম হোসেন বাড়িতে যাবে। যদিও রোদটা খুব দারুন। শীতের তিব্রতা কাঁটিয়ে রোদটা যেন আশীর্বাদ স্বরুপ। গা টা ঝড়ঝড়ে হয়ে যায়। শ্যামপুর স্টেশনের কাছে এসে দেখল আশেপাশে রিকশাটিকশা বেশি নেই। সকালবেলা আর বিকেলবেলা এদিকে প্রচুর ভিড় থাকে। দূরে একজন রিকসাওয়ালা রিকসার উপরে বসে উদাস হয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে আছে। মুখে মাক্স। একরাম হোসেন রিকশাওয়ালার কাছে গিয়ে বলল, নবীনগর বাজারে যাবে? ছেলেটা প্রথমে তার দিয়ে ঢ্যাপঢ্যাপ করে তাকি তারপর বলল, যাবোনা অইদিকে এখন। একরাম হোসেন বলল, টাকা ডাবল দিবো তারাতারি যাও। দরকারি কাজ আছে। এই কথা বলেই সে রিকসায় উঠে বসল। অগত্যা ছেলেটা রিকসা নিয়ে ছুটে চলল বাজারের দিকে।
একরাম হোসেন ছেলেটাকে বলল, তা বাসা কই তোমার?

- আজ্ঞে, বাড়ি ময়মনসিংহ।
- ও। মনে হচ্ছে তোমাকে আগে কোথাও দেখেছি, তাই ভাবলাম তোমার বাড়ি হয়তো এখানেই হবে।
রিকসা এগিয়ে চলল। একরাম হোসেন ছেলেটার সাথে কথা বলেই যাচ্ছে।
- তোমার মতো আমার একটা ছেলে আছে। তা সারাদিন যে কই কই থাকে তার হিসাব জানি না। থাকে দেশের বাইরে। এইবার এসেছে। ভেবেছি কিছুদিনের মধ্যে ওর বিয়ে দিয়ে দিবো। এতো বড় হয়ে গেছিস, বিয়েশাদি করবি না? তা আমার কথা শুনতেই চায় না। হয়েছে ওর মায়ের মতো। কথা শুনতে চায় না। তা বাবা তুমি বিয়ে করো নি?
ডানেবামে মাথা নাড়ালো ছেলেটি। একরাম হোসেন আবার বলল, ও। তাহলে তুমিও আমার ছেলের দলে। সমস্যা নেই। যাও। আমার বাবা বিয়ে করেছিলো দশ বছর বয়সে। আর আমি বিয়ে করেছিলাম উনিশ বছর বয়সে। কিন্তু নিজের ছেলের বয়স যে কতো হয়েছে আমি নিজেই ভুলে গেছি।
একরাম হোসেন কিছুক্ষন পরে বাজারে আসলেন। রিকসা থেকে নেমে ছেলেটাকে ভাড়া দিয়ে গিয়ে তিনি বললেন, তোমাকে বড় বেশিই চেনা চেনা লাগছে। আমার মাথায় কিছু আসছে না।
ভাড়াটা হাতে দিয়ে তিনি চলে যেতে গিয়েও হঠাৎ থেমে গেলেন। ছেলেটাও রিকশাটা নিয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই সরে যেতে চাইছিলো। কিন্তু একরাম হোসেন পেছন থেকে বলল, এই ছেলে দাঁড়াও। একরাম হোসেন ছেলেটার দিয়ে এগিয়ে গেল। তারপর ভালোমতো ছেলেটার কাছে গিয়ে কী একটা লক্ষ করল। তারপর বলল, তোমার গায়ে যে শার্টটা, এটা তো আমার। কিছুদিন ধরে খুঁজে পাচ্ছি না। এই শার্ট তোর কাছে আসলো কিভাবে? কথা শুনে ছেলেটার চোখ দুইটা মার্বেলের মতো বড় বড় হয়ে গেল। একরাম হোসেন ছেলেটার কলার ধরে রিকসা থেকে নামাল। তারপর বলল, বল! এটা শিউর যে এই শার্ট আমার। কবে চুরি করলি বল। সালা চোর।
ঘটনাটা আশেপাশের মানুষ দেখছিলো। একটা রিকসাওয়ালা ছেলের শার্টের কলারে হাত দেওয়াতে ঘটনাটা অনেকেই দেখছিলো। রিকসাওয়ালার গায়ে হাত তোলাটা বড্ড অন্যায়। কিন্তু যিনি হাত তুলেছেন তিনিও বয়স্ক। সুতরাং সাধারণ লোক কার পক্ষ নিবে সেটা তারা ভাবে পাচ্ছে না। একরাম হোসেন ছেলেটাকে বলল, কে তুই? তোকে এখনি পুলিশে দেব। তারপর সে ছেলেটার মুখের মাস্কটা টান মেরে খুলে ফেলে দিল।

পুরো শহড়টা যেন এক মুহুর্তের মধ্যে নিরব হয়ে গেল। সুদীর্ঘ ৩-৪ মিনিট দুজনের ঝগড়ার পর যখন একে অপরের দিকে হা করে তাকিয়ে থাকতে দেখলো, তখন আশেপাশের দর্শকরা সবাই অবাক হয়ে গেল। একরাম হোসেন নিজের ছেলের দিকে অবাক হয়ে বলল, বিজয় তুই?
- অপরিচিত কোন মানুষের সাথে পরিবারের ব্যাক্তিগত কথাগুলো না বললে হয় না তোমার?

চুপ করে ছোফায় বসে আছে বিজয়। তার বাবা ফ্লোরে পায়চারি করছে। নিজের ছেলেকে এতো কষ্ট করে লেখাপড়া করিয়েছে সে। নিজের টাকায় সে বিদেশে দামী চাকরী করতে পাঠিয়েছে। আর সেই ছেলে কিনা একটা সামান্য মেয়ের জন্য রিকসা নিয়ে মেয়ের পিছনে পিছনে ঘুড়ছে।

বিজয় বলল, মেয়েটাকে আমার পছন্দ হয় বাবা। ওকে তুমি সামান্য বলবে না। অনেক পরিশ্রমী মেয়ে। এতো পরিশ্রম করার পরেও সে নিজের বাবা মাকে কেয়ার করে। আমি ওকে বিয়ে করতে চাই।
- আমি তো নিষেধ করি নি। বিয়ে করতে চাইলে বলতি। আমি মেয়ের পরিবারের সাথে কথা বলতাম। রিকসা নিয়ে মেয়ের পিছে পিছে ঘুড়ার কী দরকার ছিলো?
- আমি শুধু মেয়েটাকে কাছে থেকে দেখতে চেয়েছি বাবা। ওর সাথে কিছুটা সময় কাঁটিয়েছি। ওকে চিনেছি। আর সব যখন জেনেই গেছো তাহলে আর কী করার। ইচ্ছে হলে তুমি মেয়ের বাবার সাথে কথা বলতে পারো।
একরাম হোসেন ছেলের কথা নিয়ে মোটেও বেশি কিছু ভাবছে না। রিকসা চালিয়েছে বলে যে ছেলে আহামরি খারাপ কাজ করে ফেলেছে সেটা মোটেও না। কিন্তু রিকসা? একরাম হোসেন বিজয়কে ডাক দিয়ে বলে, রিকসার পেছনে কত টাকা খরচ করেছিস?
- আনুমানিক হাজার পাঁচেক হবে হয়তো।
- ইদানিং গাছ থেকে টাকা ফলাচ্ছিস নাকি? এতো টাকা খরচ করার কোন মানে আছে?
বিজয় কোন কথা বলল না। চুপ করে ওয়াশরুমে চলে গেল। একরাম হোসেন টিভিটা চালু করল। তারপর আরাম করে সোফায় বসল।

পরদিন সকালে একরাম হোসেন চা খাওয়ার সময় বিজয় বলল, বাবা আমি চললাম। একরাম হোসেন অবাক হয়ে বলল, আজকেও যাবি? বিজয় মাথা নিচু করে বলল, সরি বাবা। আজকেও যাবো। একরাম হোসেন বলল, সাবধানে যাস। বিজয় বের হয়ে গেল।

রিকসা নিয়ে বসে আছে বিজয়। একটু পরেই মেয়েটা আসবে। শীত অনেকটা কমে আসছে। শীত চলে যাবে কী? কিছুক্ষন পরে মেয়েটাকে দেখা গেল। একটা শাড়ী পড়েছে সে। চুল বাঁধা। বিজয়কে সে দেখেছে। তবুও না দেখার ভান করলো কেন? বিজয়ের কেমন যেন লাগতে লাগলো। মেয়েটা এমন করছে কেন? মিতু অন্য একটা রিকসা দাঁড় করিয়ে সেটাতে উঠে চলে গেল। বিজয়ের বুকের ভিতরটা কেমন যেন লাগতে লাগল। মনে মনে সে ভাবতে লাগল, সে কী মেয়েটার সাথে কোন খারাপ ব্যবহার করেছে? কিন্তু তার জানা মনে তো সে তার সাথে কোন খারাপ ব্যাবহার করে নি। তবুও মেয়েটা এমন করছে কেন।
বিজয় মিতুর রিকসাটার পেছনে পেছনে যাচ্ছে। আশেপাশে তার খেয়াল নেই। মিতু তার সাথে এমন করল কেন। ভেবে বিষয়টা সমাধান করতে পারলো না সে। বিজয় পেছন থেকে বার বার হর্ণ দিচ্ছে। মিতু একটিবারের জন্যও তাকিয়ে দেখছে না। হঠাৎ এরকম পাষাণ হয়ে গেলে হয়। একটা ছেলের সাথে কতো ভালো ব্যাবহার করে হঠাৎ ইগনোর করলে অন্যজনের কেমন লাগে সেটা কি এই মেয়ে যানে না? কিছু ভালো লাগছে না বিজয়ের। হাত পা কাঁপছে তার। মনে মনে ভাবছে, নাহ। আর আসবো না। কী লাভ একটা মেয়ের জন্য এভাবে ঘুড়ে ঘুড়ে। মাথায় তার অসংখ্য চিন্তা। হঠাৎ একটা প্রাইভেটকার বিজয়ের রিকসার সামনে চলে আসলে বিজয় সেটা কোনভাবেই খেয়াল করে নি। গাড়িটা এসে বিজয়ের রিকসার মধ্যে সরাসরি ধাক্কা দিয়ে চলে যায়। বিজয় রিকসা থেকে ছুটে গিয়ে রাস্তায় পড়ে তার জ্ঞান হাড়ায়। প্রাইভেটে কারটা একটু সময়ের জন্য থেমেছিলো। কিন্তু ড্রাইভার পেছনে তাকিয়ে দেখল অবস্থা খুব

খারাপ। তখন গাড়িটা সে আর দাঁড় করায় না। সাথে সাথেই সেই জায়গা থেকে পালিয়ে যায়।

বিজয়ের যখন জ্ঞান আসে তখন আনুমানিক বিকেল। সে আসেপাশে তাকিয়ে দেখে একটা হাসপাতলে আছে সে। উঠতে গিয়ে উঠতে পারলো না। হাতের দিকে তাকিয়ে দেখল হাতে স্যালাইন দেওয়া হয়েছে। মাথা প্রচন্ড ভাঁড়ি। মাথার মধ্যে ব্যান্ডিস করা হয়েছে। বিজয় বুঝতে পারল তার শরির অনেক দুর্বল। কিছুক্ষন পর একটা নার্স রুমে আসলো। স্যালাইনের গতিটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে বলল, ঠিক আছেন তো এখন?
- হ্যাঁ।
- চিন্তা করবেন না। কোন সমস্যা হয় নি। আপনি সম্পুর্ণ সুস্থ আছেন। তবে কিছুদিন রেস্ট নিতে হবে।
- আমি এখানে আসলাম কখন? কে এনেছে এখানে?
- একটা মেয়ে এসেছিলো। আপনাকে ভর্তি করিয়ে দিয়ে গেছে। মাথায় তো অনেক আঘাত পেয়েছিলেন আপনি। প্রচুর ব্লিডিং হয়েছে। এক ব্যাগ রক্ত লেগেছে আপনার। রক্তটাও অই মেয়ে দিয়ে গেছে।
কে দিতে পারে রক্ত? নার্স কোন মেয়ের কথা বলছে? মিতু? তাছাড়া আর কে?
বিজয় নার্সকে বলল, আমি বাসায় যেতে পারবো কখন?
- চিন্তা করবেন না। সন্ধ্যার মধ্যে আপনি চলে যেতে পারবেন।
বাবা নিশ্চই অনেক চিন্তা করছে আমাকে নিয়ে। বাসায় গেলে তো আরেকটা ঝামেলা হবে। বাবার হাতে যে বকা খেতে হবে সেটা নিশ্চিত। কী করা যায়? নাহ। আজকে বিজয় বাসায় যাবে না। বাবাকে ফোন করে জানাবে, আজকে বন্ধুর বাসায় থাকতে হচ্ছে। কার বাসায় থাকবে সে? জাভেদকে বলে দেখলে ভালো হবে।
শুয়ে শুয়ে এসব চিন্তা করতে করতে বিকেল হয়ে আসল। সারে চারটা বাঁজে। কিছুক্ষন পরেই বিজয় দেখল দরজার পাশে মিতু দাঁড়িয়ে আছে। মিতু আস্তে করে বলল, আসতে পারি ভেতরে?
বিজয় একটু সময়ের জন্য যে চমকে গেল। তারপর বলল, হুম।
মিতু ভেতরে এসে পাশে রাখা চেয়ারটাতে বসল। তারপর বলল, ঠিক আছেন তো?
- হুম। ঠিক আছি। আপনাকে ধন্যবাদ আমার জীবন বাঁচানোর জন্য।
- জীবন বাঁচানোর মালিক তো একমাত্র আল্লাহ। আমি শুধু চেষ্টা করেছি বলতে পারেন।
বিজয় মিতুর দিয়ে তাকিয়ে দেখল, মিতুর মুখটা আগের চাইতে অনেকটা ফর্সা হয়েছে। কথা বলার ভঙ্গিটা কেমন মলিন হয়ে গেছে।
"আমার জন্য এতো কিছু করতে গেলেন কেন?", বিজয় মিতুর দিকে তাকিয়ে বলল। মিতু বলল, কী আর করলাম? মানুষ হিসেবে তো এতটুকু উপকার করতে পারি।
দুজনে কিছুক্ষন নিশ্চুপ হয়ে রইলো। বিজয় কী বলবে সেটা ভেবে পাচ্ছে না। মিতুই তার জীবনের একমাত্র মেয়ে যার সাথে কথা বলার মতো ভাষা সে মাঝে মাঝে হাড়িয়ে ফেলে।
মিতু নিরবতা ভেঙে বলল, কিছুদিন ধরে দেখছি আমাকে ফলো করছেন? আমার পেছনে পেছনে অফিস পর্যন্ত যাচ্ছেন। কারণটা কি জানতে পারি?
মিতুর এই কথার জবাব সে কিভাবে দিবে? বিজয়ের বুকটা ধরফর করছে। কী জবাব দিবে সে? বিজয় নিজের চোখটা বন্ধ করল। তারপর বলল, আমি অনেক বড় একটা ভুল করে ফেলেছি।

আপনাকে যেদিন আমি প্রথম দেখেছিলাম। সেদিনই আমি আপনাকে ভালোবেসে ফেলেছি। আমাকে কি ক্ষমা করা যায় না?
আবারো কিছুক্ষন নিরবতা। মিতু হয়তো এই কথাটা শোনার জন্য প্রস্তুত ছিলো না। কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে গেল সে। এ কী বলল বিজয়? মেয়েটাকে এভাবে লজ্জায় ফেলা কী ঠিক হলো। এখন কি করবে সে? মিতু চেয়ার থেকে উঠে বলল, আজ আসি।
তারপর দ্রুতপদে নিজের কাঁধের ব্যাগটা ঠিক করে দরজা দিয়ে বের হয়ে গেল। সন্ধ্যার দিকে বিজয় হাসপাতাল থেকে বের হল। সবচেয়ে বেশি অবাক হলো এটা শুনে যে বিজয়ের হাসপাতলের বিল মিতু দিয়ে গেছে।

বিজয় বাসার দিকে যাচ্ছে। হেঁটেই যাচ্ছে। ইচ্ছা ছিল জাভেদের বাসায় যাবে। কিন্তু যাবে না। নিজের বাসায়ই যাবে। একরাম হোসেন নিশ্চই রাগ করবেন। একটু রাগ হজমই করতে হবে।
বাসায় আসতে আসতে রাত হয়ে গেল। দরজা খুলতেই একরাম হোসেন দেখল ছেলের মাথায় ব্যান্ডেজ পেচানো। বিষয়টা দেখে সে চমকে গেল। তারপর বলল, এসব কিভাবে হল? বিজয় বলল, কিছুই হয়নি বাবা। সামান্য একটু ব্যথা পেয়েছিলাম।
- মনে তো হয় না সামান্য।
- মাথায় একটু ব্যথা পেয়েছি। আর হাতের কুনুইয়ে একটু পেয়েছি।
- তোকে কতোবার বলি এভাবে অই মেয়ের পেছনে ঘুড়ে ঘুড়ে এভাবে সময় নষ্ট করিস না। এখন বড় হয়েছিস বলে তুই যা ইচ্ছা করবি? আমি বলে দিলাম, কাল থেকে তোর রিকসা নিয়ে যাওয়া বন্ধ।
বিজয় মাথা নিচু করে বলল, ঠিক আছে বাবা। আর যাবো না।
মাথার পেছনে এখনো ব্যথা করছে। রাতে বিজয় ভালোমতন ঘুমাতে পারলো না। হাতের কব্জির মধ্যে ব্যথায় টন টন করছে। তবে বিজয়ের বার বার মিতুর কথা মনে পড়ছে। একটা জিনিস ভেবেই বিজয়ের গা শিউরে উঠছে। মেয়েটার ভালোবাসা বিজয়ের শিরা-ধমনীতে প্রবাহিত হচ্ছে। মেয়েটাও কি বিজয়কে ভালোবাসে? বিজয় সত্যিটা জানে না।

পরদিন সকালে বিজয় গেল রিকসা হাউজের সামনে। সেখানে যাওয়ার পর বিজয়কে কয়েকটা গা/লী শুনতে হলো। রিকসার মালিক বিজয়কে যাচ্ছেতাই বকছেন। বিজয় কাছে গিয়ে বলল, আংকেল! গা/লী দিয়ে নিজের চরিত্র প্রকাশ করার দরকার নেই। আমি ইচ্ছে করে একসিডেন্ট করি নি। কত টাকা লাগবে দিয়ে দিচ্ছি। রিকসা হাউজের মালিক রেগে ফোস ফোস করে বিজয়ের দিকে বার বার তাকাচ্ছে। বিজয় লোকটাকে বলল, কত টাকা লাগবে? লোকটা বলল, ৫০০০ টাকা লাগবে। রিকসার এক সাইট তো এক্কেবারে শেষ। বিজয়ের আর কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। লোকটার হাতে টাকা ধরিয়ে দিয়ে সেখান থেকে বের হয়ে আসলো।
আজকে আর রিকসা নিবে না সে। হেঁটেই যাবে বাজারের দিকে। হাটুতে একটু ব্যথা আছে। তবে হাঁটতে কোন সমস্যা হচ্ছে না। অনেক দিন ধরে বন্ধুদের সাথে কথা হচ্ছে না। ওরা কেমন আছে কোন খবর নেই তাদের। প্রথম দিনের মতো গাছের নিচের বৈঠক আর বসে না। অনেক দিন ধরে চা-টাও খাওয়া হচ্ছে না। বিজয় হাঁটতে হাঁটতে বাজারের সামনে গেল। একটু পরেই

মিতু আসবে। আগের মতো আর শীত নেই। আস্তে আস্তে শীত চলে যাবে। বিজয়ের আফসোস গ্রীষ্মকালটা তার দেখা হবে না। অনেক দিন ধরে সে কালবৈশাখী দেখে না। ছোটবেলায় বৃষ্টিতে ভেঁজা। চারদিকে আকাশ কালো হয়ে আসাটা সে অনেক মিস করে। এর পরেরবার যখন আসবে তখন কালবৈশাখীর কোন ঝড়ের দিনে ঘুড়তে আসবে।
বিজয় রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখল মিতু নামের মেয়েটা আসছে। আজকে তাকে এতো সুন্দর লাগার কারণ কী? মিতু আশেপাশে তাকানোর পর বিজয়ের দিকে তাকাল। অল্প কিছুক্ষন। আজকে বিজয় রিকসা নিয়ে আসে নি। দুজনের কিছুক্ষনের জন্য চোখাচোখি। কাছে আসা, কথা বলা কিছুই হলো না। মিতু একসময় একটা রিকসায় উঠে অফিসের দিকে রওনা হয়ে গেল। এর চেয়ে বেশি কিছু আর হলো না। বিজয় মেয়েটার চোখের ভাষা বুঝতে পারে না। সে কী বলতে চায়? বিজয় রাস্তা পার হয়। মিতু যে জায়গাটাতে দাঁড়িয়ে ছিলো সেখানে যায়। একটা জিনিসের জন্য। যাওয়ার পর নিচের দিকে তাকিয়ে দেখে একটা চিরকুট। রাস্তায় পড়ে আছে। বিজয় সেটা হাতে নিল। তারপর দেখে, মিতুর হাতের লেখা। সে লিখেছে, "ভালোবেসে কি কেউ কখনো ভুল করে?" এতোটুকুই লেখা।

আজকে বিকেলবেলা জাভেদ ফোন করল। বলল, বন্ধু। ইনশাআল্লাহ! কালকে আমি আর আরিফ চলে যাচ্ছি। তাই ভাবলাম আজকে বিকেলে তোদের সাথে একটিবারের জন্য দেখা করে যাই। বিজয় বলল, আসবো।
সময় কতো দ্রুত ফুরিয়ে যায়। আর কিছুদিন পরে তাকেও চলে যেতে হবে। বিজয় আকাশের দিকে তাকায়। খুব ইচ্ছে করে এই দেশে থেকে যেতে। একদিন সে বাবাকে বলবে, বাবা! আমি আর বিদেশ যাচ্ছি না। এই দেশেই কোন কাজ করবো। কী লাভ এতো টাকা দিয়ে? যদি ভালোবাসার জিনিসগুলো না থাকে?
বিজয়ের যখন সাত বছর। তখন তার মা চলে গেল। জীবনের অর্ধেক সুখ তো জীবন থেকে তখনি চলে গেছে।

বিকেলবেলা আজকে আবার সব বন্ধুরা একত্রিত হলো। তবে প্রথমদিনের মতো ভালোলাগা আজকে নেই। মনে হচ্ছে এখানে না আসতে পারলেই হয়তো ভালো হতো। বিজয় জাভেদকে বলল, তা কখন বের হবি?
- কাল ইনশাআল্লাহ্ ভোরে রওনা হবো। আমি আর আরিফ একসাথেই রওনা হবো।
- অহ। তাহলে কালকে আর দেখা হচ্ছে না। আজকেই শেষ দেখা।
- হয়তো। তবে আমরা তো মাঝে মাঝে আসি এখানে। কিন্তু এটা ভেবেই খারাপ লাগছে যে তোর সাথে আবার কবে দেখা হবে কে জানে।
- ধুর। এসব নিয়ে চিন্তা করিস না। দেখিস আবার দ্রুতই দেখা হবে। আর তাছাড়া ফোনে তো কথা হবেই। এতো চিন্তা কিসের? সন্ধ্যার দিকে আড্ডাটা ভেঙে গেল। ভালো থাকিস, নিজের শরিরের যত্ন নিস, এসব কথা ছাড়া যাওয়ার সময় আর কোন কথা হলো না। বিজয়ের ইচ্ছা ছিলো আড্ডাটা আরেকটু লম্বা করতে। জাভেদ বিজয়ের কাঁধে হাত রেখে বলল, ব্যাগপত্র গোছানো হয়নি। অনেক কাজ। অন্য আরেকদিন দেখা হবে।

বাসার আসার পরে বিজয় কিছুক্ষন বিছানায় শুয়ে রইল। তার বিশ্রাম নেওয়া উচিৎ। আজকে হাঁটাহাটি একটু বেশিই হয়ে গেছে। পায়ে ব্যথা শুরু হয়ে গেছে। একটু ঘুমাতে পারলে ভালো লাগতো। মাথায় একটু একটু যন্ত্রনা হচ্ছে। মাথায় ভালোই আঘাত পেয়েছিলো সে। প্রচুর র/ক্তক্ষরণ হয়েছে। মাঝে মাঝে মাথায় কিছু কিছু জায়গাতে ঝিম ঝিম করছে।

পরদিন সকালে বিজয় ঘুম থেকে উঠল। তারপর হালকা কিছু নাস্তা করে তার বাবাকে বলল, বাবা। আমি বাইরে যাচ্ছি।
- কোথায় যাবি?
- সরি বাবা।
- তাহলে আমার কথা শুনছিস না।

বিজয় প্রথমে রিকসা হাউজে গেল। তারপর সেখান থেকে একটা রিকসা নিল। রিকসার মালিক বলে দিল, সাবধানে চালাবেন। কালকের মতো রাস্তায় শুয়ে থাইকেন না, বুচ্ছেন। "চেষ্টা করব", বলে বিজয় বাজারের দিকে রওনা হয়ে গেল। আর কিছুক্ষন পরে মিতু আসবে। মেয়েটা আজকে তার জন্য অপেক্ষা করবে কিনা জানা নেই। তবুও বিজয় যাচ্ছে। কেন জানি মনে হচ্ছে আজকে মিতু আসবে। কালকের চিরকুটটাতে অনেক কথা লুকানো আছে। অবশ্যই বিজয় ভালোবেসে ভুল করে নি। এটা তার কথা না। এটা মেয়েটার কথা।
বাজারে যাওয়ার পর বিজয় সত্যি অবাক হয়ে দেখল মিতু রাস্তার অপর পাশে দাঁড়িয়ে আছে। চোখ দেখেই বুঝা যায় সে কারো জন্য অপেক্ষা করছে।

একটা ভালোবাসার গল্প

মিতু বলল, এতো তারাতারি চালানোর কী দরকার? অফিস দেরি আছে তো। আর আপনার মাথায় সমস্যা আছে তো। নাহলে মাথায় ব্যান্ডেজ নিয়ে কেউ রিকসা চালায়? নিজেকে কী মনে করেন? হাল্ক?
- তেমনটাই।
- আপনার কিছুদিন আসতে হবে না। বাড়িতে রেস্ট নিবেন।
- আচ্ছা। চেষ্টা করবো।
- আস্তে আস্তে চালান।
বিজয় রিকসার গতি কমায়। আস্তে আস্তে চালানোর চেষ্টা করে। বিজয়ের একটা কথা মিতুকে বলতে ইচ্ছে করে। সেটা হচ্ছে, এতোদিন আমাকে এভাবে ইগনোর করলেন কেন? আমার কোন কথায় কি আপনি রাগ করেছিলেন? কিন্তু বিজয় কোনভাবেই মিতুকে সেই কথাটা বলতে পারছে না।
মিতু আবার বলে উঠে, এখন থেকে ভালোভাবে চালাবেন। সেদিন আপনার যে অবস্থা হয়েছিলো। আমি যদি যেখানে না থাকতাম তাহলে কী যে হতো কে যানে।
"সেই জন্যই তো আপনাকে চাই", কথাটা মনে মনে বলে বিজয়।
কিছুক্ষন পর মেয়েটার অফিসের সামনে এসে দাঁড়ায় সে। মেয়েটা রিকসা থেকে নেমে মুচকি হেঁসে বলে, আশা করি ভাড়া দিতে হবে না। বিজয় মাথা নাড়ায়। ভাঁড়া দিতে হবে না। সে ভাঁড়া নেওয়ার জন্য আসে না। সে শুধু মেয়েটার মুখে এমন হাঁসিটা বার বার দেখতে চায়। এইটুকু দেখার জন্যই সে বার বার আসে।

একরাম হোসের বিজয়কে মাঝে মাঝে বলে, তুই যে দিন দিন পাগল হয়ে যাচ্ছিস এটা তুই বুঝতে পারছিস না? বিজয় বুঝতে পারে পাগলামিটা তার বেশিই হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তবুও তার এই পাগলামিটা বার বার করতে ইচ্ছে করছে।
একরাম হোসেন বলল, এই কিছুদিন কোথায় যাবি না। তুই কিন্তু অসুস্থ। বিজয় তার বাবাকে বলে, আমি এখন মোটেও অসুস্থ না বাবা। আমি এখন যথেষ্ঠ ঠিক আছি। তুমি কেবল আমাকে নিয়ে শুধু শুধু চিন্তা করছো।
একরাম হোসেন মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে বলে, তুই যা ইচ্ছা তাই কর। তবে মেয়ে দেখতে তো আমাকেই যেতে হবে তাই না? তখন আমি যেতে পারবো না। বিজয় বলে, যেতে হবে না তোমাকে। আমি নিজে বড় হয়েছি। আমি একাই যেতে পারি।

এভাবে চলতে লাগল কিছুদিন। প্রতিদিনই তাদের দেখা হয়। তবে কথা দুজনের মধ্যে খুব কম হয়। বিজয়ের কথা বলার সাহস হয় না। মেয়েটাকে ভালোবাসার কথা বলার পর থেকে বিজয়

মেয়েটার প্রতি যেন আরো দুর্বল হয়ে গেছে। তবে মেয়েটা স্বাভাবিক আছে। যেন তাদের মধ্যে কিছুই হয় নি। মনে হচ্ছে সে সব কিছু ভুলে গেছে। তার আচরণ স্বাভাবিক। অথচ এই মেয়েটাই সেদিন লিখেছিলো, "ভালোবেসে কেউ ভুল করে?" মাঝে মাঝেই ভালোবাসার কথাটা বলতে ইচ্ছে করে। কিন্তু বিজয় পারে না। বলার সাহস হয় না।
ছুটির দিনে মিতু আসতে বলে। সেদিন মিতু আসতে বলল বিজয়কে। সেদিন সে রেডি হল। মিতুর সাথে দেখা করবে। বিকেলবেলা। বিজয় অপেক্ষা করছে মিতুর জন্য। মিতু আসবে একটু পরে। বিকেল হলে একটু শীত শীত লাগে। কুয়াশা পড়তে আরাম্ব করে চারদিকে। সেই মৃদু কুয়াশার মধ্যেই মিতু আসবে।
বিজয় অপেক্ষা করে অনেক্ষন। বিকেলের আলো যখন অনেকটা কমে আসে তখন মিতু আসে। আজকেও সে একটা শাড়ী পড়েছে। চুলগুলো খোঁপা করা। কালো শাড়ী। বিজয় এক দৃষ্টিতে মিতুর দিকে তাকিয়ে থাকে। মিতু একসময় তার কাছে এসে তাকে বলে, চলেন আজকে নতুন একটা জায়গায় ঘুড়ে আসি। বিজয় অনিশ্চিত গলায় বলে, কোথায় যাবেন?
- বিশেষ কোন জায়গায় নয়। সেখানেই যাবো যেখানে দুজনে একটু ভালোভাবে কথা বলতে পারবো।
বিজয় আর কিছু বলে না। দুজন একটা রিকসায় উঠে রওনা হয়। মিতু কিছুটা ঘেঁষেই বসেছে বিজয়ের পাশে। রিকসাটা বড্ড চাঁপা। মেয়েটার শাড়ির তিব্র ঘ্রাণ তাকে ক্রমশ বিমোহিত করে দিচ্ছে। মিতুর হাতের স্পর্শ বার বার তার গায়ের লোমগুলোকে প্রভাবিত করছে। কিন্তু সে নিরুপায়।

অনেকটুকু কুয়াশা পড়ে গেছে। তারা যেখানে আসলো আশেপাশে কোথাও কোন ঘড়বাড়ি নেই। সামনে অনেক বড় একটা সবুজ খেলার মাঠ। মাঠের পাশটাতে কয়েকটা বেঞ্চ। আশেপাশেও কয়েকজন মানুষ দেখা যাচ্ছে। দূরে কয়েকটা ছেলেমেয়ে খেলাধুলা করছে। তাদের বাবা-মায়েরা হয়তো খেলাগুলো কিছুটা উপভোগ করার চেষ্টা করছে। মিতু বলল, আসুন ওখানটাতে গিয়ে একটু বসি।
- কী আছে এখানে?
- শুন্যতার চাইতে বড় জিনিস কী হতে পারে এই পৃথিবীতে। শুন্যতাই আছে ওখানে।
একটা বেঞ্চের উপরে বসলো দুজনে। বিজয় বলল, তা কেন ডাকলেন এখানে? কোন বিশেষ কারণ আছে কী?
- বলতে পারেন আজকে আমার মনটা ভালো। তাই ভাবলাম এখানে কিছুক্ষন কাঁটাই।
- আমাকে ডাকলেন যে?
- বলতে পারেন, সুন্দর মুহুর্তগুলো একা একা কাঁটানোর চেয়ে ভাবলাম আপনাকে নিয়ে আসি। মুহুর্তগুলো আপনার সাথে ভাগাভাগি করি। এটাই।
- অনেক মানুষই তো আছে পৃথিবীতে। সেখানে আমিই কেন? আমি কী আপনার কাছে কোন বিশেষ কিছু?
- বিশেষ তো অবশ্যই। সেটা বুঝতেই পারছেন।
- হুম হতেই পারে। কারো সাথে কথাবার্তা হতে হতে পরিচয় হয়। দেখা হয় নিয়মিত। আস্তে আস্তে তারা তো বিশেষ মানুষ হবেই।

দুজন কিছুক্ষন চুপ। বিজয় কিছুক্ষন দূরে ছেলেমেয়েগুলোর খেলা দেখল। কী খেলা ওইটা? বিজয় নাম মনে করতে পারছে না। মিতুকে জিজ্ঞেস করলে মিতু হয়তো বলতে পারবে। বিজয় তাই মিতুকে উদ্দেশ করে কিছু বলতে গিয়েও যেন থেমে গেল।
মিতু বলল, যানেন। আমি অনেক বড় একটা ভুল করে ফেলেছি।

কথাটা শুনে বিজয় যেন পুরোটাই থমকে গেল। মিতু বলল, দিন দিন আমি ক্রমশ আপনার প্রতি দুর্বল হয়ে যাচ্ছি। আমি আপনাকে ভালোবেসে ফেলেছি। আমি জানি না এভাবে কারো প্রতি দুর্বলতা আমার জন্য ঠিক হবে কিনা। তবে আমি নিজে অনেক চেষ্টা করেও নিজেকে সামলাতে পারছি না। এই কথাটা আমি আপনাকে বলতাম না। তবে বাধ্য হয়েই বলতে হচ্ছে। আমি আর চাই না আপনি কেবল আমার জন্য রিকসা নিয়ে শুধু শুধু বসে থাকেন। পারলে আমাকে ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করেন প্লিজ। দিন যত যাচ্ছে আপনার প্রতি আমার মায়াটা ক্রমশ বাড়ছেই। আমি চাই না আর সেটা বাড়ুক।

দুজন আবার কিছুক্ষন নিরব। দিনের আলো অনেকটাই কমে এসেছে। কিছুক্ষন পরে হয়তো মাগরিবের আযান হবে। বাবা মায়েরা তাদের ছেলেমেয়েগুলোকে নিয়ে বাসার দিকে রওনা হচ্ছে। কুয়াশার চাদর দিয়ে পুরো এলাকাটা ক্রমশ ঢেকে যাচ্ছে। বিজয় মনে মনে বলছে, আপনিই তো বলেছিলেন, ভালোবাসা কী অপরাধ? যে, ভুল হয়ে গেলে তার জন্য ক্ষমা চাইতে হবে?
বিজয় নিরবতা ভেঙে মিতুকে বলে, দুজনেই তো ভুল করলাম। দুজনের ভুলটা শুধরে নেওয়া যায় না?
- আমি সেটা জানিনা।
- আপনি চাইলে তো করা যেতে পারে।
- দেখুন। আপনার আমার জীবনের মধ্যে অনেক তফাৎ। এতোটা তফাত নিয়ে কিভাবে সম্ভব?
- তারমানে আপনি এটাই বোঝাতে চাচ্ছেন যে আমি একজন রিকসাচালক বলে আমার সাথে সম্পর্ক করা যাচ্ছেনা। সেটাই তো।

প্রথম মিতুর চোখে সে পানি দেখেছিলো যেদিন সে কয়েকটা খারাপ ছেলেদের থেকে সে মিতুকে বাঁচিয়েছিলো। আবার পুনারায় বিজয় আজকে মিতুর চোখে পানি দেখতে পেল। ছল ছল করছে তার চোখদুটা।
মিতু বলল, এমনটা বলবেন না প্লিজ। আমি আর এসব নিতে পারছিনা। আমি কোথায় যাবো বলুন তো। আমাকে ক্ষমা করে দিন প্লিজ।
মিতুর চোখের পানিতে দুই গাল ভিঁজে যাচ্ছে। নিজের জন্য কাউকে সে এভাবে কাঁদতে দেখে নি। কি বলে শান্তনা দিবে মেয়েটাকে। কিছু বলার মতো ভাষা সে খুঁজে পাচ্ছে না। শুধু বিজয় এতোটুকুই বলল, তো আপনি এখন কী চাচ্ছেন?
- আমি চাচ্ছি আমাকে ভুলে যান প্লিজ। যদিও আমার কিছুটা কষ্ট হবে তবে সেটা অল্প। জানেন তো, একটা গাছ কচি বয়সেই ছেঁটে ফেলে দিতে হয়। গাছটা বড় হয়ে গেলে সেটা আর সম্ভব হয় না। ভালোবাসাটাও তেমনই। সময় যত বেশি হয়। ভালোবাসার গভীরতা তেমনটা বাড়তে

থাকে। ভালোবাসা বেশি হয়ে গেলে সেটা আর কমানো সম্ভব না।
- তারমানে আপনি বলতে চাইছেন আমাদের মধ্যে ভালোবাসা হতে পারে না?
মিতু কিছুটা শক্ত গলায় বলল, না। আমাকে মাফ করে দিবেন। আমাকে ভুলে যাবেন প্লিজ।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে অনেক্ষন। দিনের আলো এখন বেশি অবশিষ্ট নেই। বিজয় আর মিতু চুপ করে বসে আছে। মাঝে মাঝে দূরে কোথাও একটা কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ শোনা যাচ্ছে। তাছাড়া পরিবেশটাও অনেকটা ঠান্ডা হয়ে গেছে।
একসময় মিতু বলল, তাহলে আমি আজ আসছি। ভালো থাকবেন। আর যদি পারেন আমাকে ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করবেন।
মিতু চলে গেল। যাওয়ার সময় বিজয় অপলকভাবে মিতুর যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রইল। মিতুর হয়তো ইচ্ছে করছিলো একটু পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখতে। তবে তাকাল না। সোজা সামনের দিকে দৃষ্টি রেখে সে চলে গেল।

বাসায় এসে কিছু ভালো লাগছে না বিজয়ের। রাতে কিছু খেল না বিজয়। একরাম হোসেন বার বার খাবার জন্য ডাকছেন। কিন্তু বিজয়ের এক কথা, আজ তার খেতে ইচ্ছে করছে না। অনেকবার ডাকার পরেও যখন বিজয় আসলো না। তখন একরাম হোসেন বিজয়ের রুমে গেল। বিজয় বিছানায় শুয়ে আছে। একরাম হোসেন বলল, বেশি পাগলামি করলে এমনি হয়। কী হয়েছে এখন খুলে বল।
- বাবা। এখানে আর আমার ভালো লাগছে না। আমি আর এখানে থাকতে চাই না। ভেবেছি বিদেশ চলে যাবো।
- অই মেয়েটার জন্য এভাবে তুই চলে যাবি?
- হ্যাঁ বাবা। আমি চলে যাবো।
- এভাবে ইচ্ছে হলেই চলে যাবি? আমার কথা ভাবলি না? ভেবেছিলাম তোকে এইবার বিয়ে দিয়ে তারপরেই তোকে যেতে দেবো।
- আমার কিছু ভাল্লাগছে না বাবা। আমি কিছু ভাবতে পারছি না। আমি শিগ্রই চলে যাচ্ছি। তুমি ভালো থাকবে আশা করি।
একরাম হোসেন ছেলের মুখের উপরে এই মুহুর্তে কিছু বলতে পারছে না। চেষ্টা সে অনেক করল। কিন্তু বিজয়ের এক কথা, সে আর দেশে থাকবে না।

পাসপোর্ট রেডি করে নেয় বিজয়। বন্ধু করিম আর সালামকে জানায় সে চলে যাচ্ছে। বিষয়টা শুনে অবাক হয় দুজন। বিজয়ের কাছে কারণ জানতে চাইলে যে জানায়, এখানে তার আর ভালো লাগছে না।
করিম আর সামাদ বুঝতে পারল বিজয়ের অবশ্যই কোন একটা ঝামেলা হয়েছে। সামাদ বার বার সমস্যাটার কথা খুলে বলতে বলে। বিজয় কোনভাবেই আসল কাহিনীটা বলে না।
অবশেষে বাবা আর বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় জানিয়ে দেশ ছেড়ে চলে যায় বিজয়। যাওয়ার সময় বার বার চোখ গড়িয়ে কয়েকবার পানি পড়ল। বাবা বার বার বলে দিলো, নিজের যত্ন নিবি। আর কখনোই বাড়তি কোন চিন্তা করবি না।

মিতুর কিছুদিন ধরে ঘুম হচ্ছে না। ভেবেছিলো ছেলেটার সাথে কথা না হলেও রাস্তায় হয়তো মাঝে মাঝে দেখা হবে। কিন্তু তেমনটা হচ্ছে না। মিতু রাস্তায় ছেলেটাকে অনেক খোঁজাখুঁজি করার পরেও বিজয়কে দেখতে পাচ্ছে না। ব্যাপারটা মিতুকে প্রচণ্ডভাবে হতাস বানিয়ে ফেলে। একদিন শুক্রবারে মিতু বোরখা পড়ল। মিতুর বাবা বলল, কই যাচ্ছিস? মিতু মিথ্যে বলল। সেদিন মিতু বাজারের সামনে অনেক্ষন অপেক্ষা করল বিজয়ের জন্য। আশেপাশে অনেক দোকানপাট। কয়েকজন হয়তো তাকে খেয়াল করছে। সে বোরখা পরে এভাবে অনেক্ষনযাবৎ দাঁড়িয়ে আছে। লোকে তো খেয়াল করারই কথা। কিন্তু মিতু কোনভাবেই বিজয়কে দেখতে পেল না। হতাস হয়ে ফিরে আসে সে। বুকটা হঠাৎ করে কেমন যেন করে উঠে।
এই কদিনে তার খাওয়াদাওয়া একদম কমে গেছে। মিতুর বাবা-মা এসব জানে না। মিতু তাদের সামনে হাঁসিখুশি থাকে। কথা বলে। একই টেবিলে বসে খাবার খায়। একসাথে টিভি দেখে। তবে তার মনের ভিতরে হাহাকার করছে। ভেতরটা যেন জ্বলেপুড়ে যাচ্ছে। মিতু এসব যেন নিতে পারছে না।
রাইসা ব্যাপারটা ভালোভাবে বুঝতে পারে। একদিন মিতুর সামনে এসে রাইসা বলল, কিছুদিন ধরে দেখছি তুই সারাক্ষন মন খারাপ করে থাকিস। আর কিছুদিন ধরে ওই রিকসাওয়ালা ছেলেটাকেও দেখছিনা। কি হয়েছে তোর?

মিতু আর রাইসা বেঞ্চের উপর বসে আছে। সামনে সেই পুকুরটা। বিজয়ের সাথে সে এই বেঞ্চেই একদিন বসেছিলো। রাইসা বলল, তোদের মধ্যে কি হয়েছে খুলে বল তো?
রাইসা কিছুক্ষন চুপ করে থাকার পর বলল, আমি ছেলেটাকে আস্তে আস্তে ভালোবাসতে আরাম্ব করেছিলাম। আর আমি চাই না আমাদের মধ্যে কোন প্রকার ভালোবাসা হোক।
- তো তুই এভাবে মন খারাপ করে আছিস কেন?
- আমি কিছুদিন ধরে ছেলেটাকে অনেক খুঁজলাম। পাচ্ছি না কোথাও। রাইসা, ভেবেছিলাম ছেলেটা সামান্য রিকসা চালায়। গরিব ফ্যামিলির ছেলে। তার সাথে বিয়ে আমার ফ্যামিলির কেউ মেনে নিবে না। তাই সম্পর্কটা আর আগাই নি। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আমি যেন ভুল করেছি। অনেক বড় একটা ভুল করে ফেলেছি।
- থাক। এটা নিয়ে তুই আর চিন্তা করিস না। যেটা হয়ে গেছে, সেটা নিয়ে চিন্তা করে তো আর লাভ নেই। এখন নিজেকে ঠিক করার চেষ্টা কর। তুই তো স্ট্রং পার্সোনালিটির মেয়ে। তোকে এভাবে কারো জন্য ভেঙে পড়তে মানায় না।
- কিন্তু আমি পারছি না। আমার এমন লাগছে কেন রে?
- এমনটা একটু লাগবেই। তোর ফ্যামিলি বন্ধুদের সাথে সময় দেওয়ার চেষ্টা কর। আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে।
- তুই আমাকে ছেলেটাকে ভুলে যেতে বলছিস?
- হ্যা। আমি তাই চাই। আর মনে করি, এটাই তোর জন্য ভালো হবে।
মিতু আর কথা বলে না। রাইসা বলল, মিতু! বলতো কতদিন ধরে আমাদের পুরোনো বন্ধুদের দেখা হয় না?
- কী আর হবে দেখা করে?

- জানি কিছুই হবে না। কী হতে বলিস?
- জানিনা।
- তুই বলতে পারিস পৃথিবীর কোন কিছুতেই কিছু হয় না। একবার ভাব, তুই আমি বেঁচে থেকে পৃথিবীর কিছু হচ্ছে?
- না।
- কোন কিছুতেই আসলেই কিছু হয় না। আমাদের সবকিছু এমনি এমনিই করতে হয়।

সন্ধ্যার সময় মিতু বাসায় আসে। এসে ফ্রেশ হয়ে নেয়। বিজয়কে খুঁজে পাওয়ার আশা সে প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। কিন্তু ছেলেটার কথা মনে পড়ে তার। মনে পড়ে রিকসায় করে অফিসে যাওয়ার সময়গুলোর কথা। মনে পড়ে সেদিন রাতের কথা। খারাপ ছেলেগুলো মিতুকে এখন বিরক্ত করতে আসে না।

শীতকাল বিদায় নিয়েছে অনেক আগেই। এখন বৈশাখ মাস। গত রাতেই প্রচন্ড ঝড় হয়েছে। আজকে আকাশ মেঘলা। ছাতা হাতে নিয়ে অফিসে যেতে হয়। একটু পর পরই হালকা বৃষ্টির ফোঁটা গা ভিজিয়ে দিতে আসে। মিতু মনে মনে বলে, এই মেঘলা সময়টাতে আপনার সাথে আর দেখা হচ্ছে না। রাস্তায় দাঁড়ালে এখনো মিতু উঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করে। একদিন হয়তো ছেলেটা আসবে। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতেই আসবে। এসেই বলবে, আমরা যে ভুলটা করেছি তা শুধরে নেওয়া যায় না? আসুন না, আমরা এক হয়ে যাই।
মিতু বলবে, যাবে। অবশ্যই যাবে। সমাজের বানানো নিয়মকানুন ভেঙে আমরা এক হবো।
কিন্তু ছেলেটা আসে না। অফিসে মনোযোগ নেই আগের মতো। মাঝে মাঝেই মিতু ভাবে, তার জীবনটা অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। মিতু শুকিয়ে যাচ্ছে। চোখ দুইটা আস্তে আস্তে কোটরের ভিতর দিকে চলে যাচ্ছে।

মিতুর বাবা- মা প্রায় হতাস। এভাবে নিজের মেয়েকে আর সে কতদিন নিজের ঘড়ে রাখবে? বাইরে থেকে নানান ধরনের কথা কানে আসছে। অনেকে নাকি বলছে, নিজের মেয়ের কামাই তো অনেক খাওয়া হয়েছে। এইবার মেয়ের একটা ব্যাবস্থা করতে হবে না?
কথাটা মিথ্যে নয়। এইভাবে আর কতদিন? নিজেদের স্বার্থের জন্য মেয়ের ভবিষ্যৎ নষ্ট করা যাবে? মিতুর বাবার কপালে চিন্তার ভাঁজ। মিতুর ভাই যখন বেঁচে ছিলো তখন মিতু অনেকটা ছোটোই ছিলো। তখন তার অনেক বিয়ের সম্বন্ধ আসতো। অনেক ভালো ঘড়ের ছেলে, ছেলে দামি চাকরি করে। কিন্তু মিতুর ভাই তখন বিয়েতে রাজি ছিলো না। তার ইচ্ছে ছিলো মিতুকে সে অনেক লেখাপড়া করাবে। তার ভাইয়ের চাকরি হলে মিতু কিছুটা আশা ফিরে পেয়েছিলো। ভেবেছিলো, নিজের স্বপ্নটা সে পুরণ করতে পারবে। কিন্তু সেটা আর হলো কোথায়? এদিকে মিতুর বয়স দিন দিন বাড়ছে। এখন আর আগের মতো বিয়ের সম্বন্ধ আসে না। মাঝে মাঝে কয়েকটা সম্বন্ধ আসে। কিন্তু মিতুর বাবা বুঝতে পারে ছেলেপক্ষ একটা বড় অংকের যৌতুক চাচ্ছে। এতো টাকা দেওয়ার সামর্থ্য নেই তাদের।

মিতু নিয়মিত অফিসে যাচ্ছে। মিতু ভাবার চেষ্টা করে, এতোদিন তার সাথে যেটা হয়েছে সেটা

শুধুমাত্র একটা স্বপ্ন। বাস্তবে এর কোন অস্তিত্ব নেই। সেটাই বার বার ভাবার চেষ্টা করে। সবটা চেষ্টাই সফল হয়ে উঠে না। রাতে মাঝে মাঝেই তার ঘুম হয় না। রাইসা মাঝে মাঝে বলে, তুই নিজে খুব ইনট্রোভার্ট। কারো সাথে মিশিস না, কথা বলিস না, সেই কারণেই তোর এতো ডিপ্রেশন। একা থাকলে তুই এই সমস্যা সহজে কাঁটিয়ে উঠতে পারবি না। সবার সাথে মেলামেশা কথাবার্তা বলা আরাম্ব কর। দেখবি কিছুদিনের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে গেছে। তবে মিতু বার বার বলে, আমি পারি না। অনেক চেষ্টা করি, পারি না। হয়তো সৃষ্টিকর্তা আমাকে এভাবেই বানিয়েছে। আমি ইনট্রোভার্ট।

মিতুর বাবা মিতুকে নিয়ে রাগ করে না। তার বাবা-মা কখনোই তাদের মেয়েকে সংসারের বোঁঝা মনে করে না। মিতুই তো পরিবারটাকে আগলে রেখেছে নিজের মধ্যে।
মিতুর বাবা আব্দুস সালাম মেয়ের কাছে গিয়ে চুপ করে বসে থাকে। অনেক্ষন বসে থাকার পর সে বলে, তোর জন্য একটা ছেলে দেখেছিলাম। অনেক বড় লোক। ছেলের ব্যাবহারও ভালো। মিতু চুপ করে থাকে।
অনেক্ষন পরে মিতু বলে, ছেলেমেয়ে কয়জন এইবার?
- একটা ছেলে, ২ বছর। ছেলেকে জন্ম দেওয়ার সময় মা মারা গিয়েছিলো। বয়স বেশি না। তুই একবার দেখতে পারিস। মিতু কিছু বলে না। মিতুর বাবা বলে, ছেলেটা তোর সাথে একটু দেখা করতে চায়। তুই না বলিস না।

পরদিন মিতু ছেলেটার দেওয়া ঠিকানায় গিয়ে পৌছালো। একটা রেস্টুরেন্ট। মিতু যাওয়ার পরেই ছেলেটাকে চিনতে পারলো। ছেলেটার নাম রাসেদুজ্জামান। বয়স যদিও কম তবে চেহাড়ায় বয়সের ছাপ পড়েছে। মিতু চেয়ারটাতে বসতে বসতে বলল, তো কেমন আছেন?
- ভালো আছি। আপনি?
- হুম। আমিও ভালো আছি।
মিতু চুপ করে আছে। ছেলেটার কেবল নামটা জানে আর জানে তার একটা ২ বছরের ছেলে আছে। এর বাইরে সে আর কিছু জানে না। কী বলবে আর?
ছেলেটাই কিছুক্ষন পরে বলল, তো কিসের চাকরি করছেন যেন?
- একটা কম্পানিতে গ্রাফিক্স ডিজাইনার হিসাবে কাজ করছি।
- অহ্। মনে হচ্ছে আপনি খুব ক্রিয়েটিভ। ডিজাইনিং যারা করে তাদের তো সৃজনশীলতা থাকে।
মিতু চুপ করে থাকে।
ছেলেটা বলে, আমার আগের একজন স্ত্রী ছিলো এবং আমার একটা ছেলেও আছে, আশা করি জানেন।
- হ্যাঁ, জানি।
- ছেলেটার মায়ের খুব অভাব। আমি একটা স্ত্রী খুঁজছি এর চেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমি আমার ছেলের জন্য একটা ভালো মা খুঁজছি।
মিতু আবার চুপ করে থাকে। ছেলেটা বলে, কফি খাবেন?

দুজনের জন্য দুইটা কফি দেওয়া হয়। মিতু কফিতে চুমুক দেয়। তারপর একসময় মিতু বলে, আপনার পরিকল্পনা ভালো। ছেলের জন্য একটা ভালো মা খোঁজা অবশ্যই জরুরি। তবে আমি আসলে বিয়েটা করতে চাচ্ছিনা। এর কারণটা হয়তো আপনি জানেন। আমি আমার ফ্যামিলির একমাত্র মেয়ে। আপনার ছেলেকে দেখাশোনা করতে গিয়ে আমার বাবা-মায়ের থেকে দূরে চলে যেতে চাই না। আমাকে মাফ করে দিবেন প্লিজ। আমি দোয়া করবো আপনি একজন ভালো স্ত্রী পাবেন এবং আপনার ছেলে ভালো একজন মা পাবে।
মিতু চলে আসে সেদিন। ছেলেটা কোন প্রকার বাঁধা দিলো না। কিছুক্ষন হয়তো মিতুর চলে যাওয়ার দিকে তাঁকিয়ে ছিলো।

অপেক্ষা

তুই ছেলেটাকে মুখের উপরে না বলে দিলি? জানিস কতো খুঁজে তোর জন্য একটা ভালো ছেলে দেখেছিলাম। আর তুই কিনা... কথাগুলো বললেন আব্দুস সালাম। তার মুখে হতাশার ছাপ। মিতুর চোখ ভিঁজে আসছে। আব্দুস সালাম বলতে লাগলেন, এখন বিয়ে করবি না তো আর কবে বিয়ে করবি? তোর বান্ধবী তোর কাজিনরা এখনো বিয়ে করার বাকি আছে? আর এদিকে তুই ঘড়ে আইবুড়ো হয়ে বসে আছিস। মিতু এইবার সরাসরি কান্না করে দিলো। বলল, বাবা প্লিজ থামো। আমি এখন বিয়ে করবো না।
- তুই তো বড় হচ্ছিস। এখন তো তোর একটু বোঝা দরকার। তুই এভাবে ছেলেটাকে মুখের উপর না বলে দিলি। ছেলেটা কী মনে করবে এখন? আর বছরে কয়টা বিয়ের সম্বন্ধ আসে তোর? যত বড় হচ্ছিস তর বয়স্ক বয়স্ক ছেলেদের বিয়ে আসবে।

আব্দুস সালাম কথাগুলো মেয়েকে কোনদিনও বলতেন না। কিন্তু এখন বলতে হচ্ছে। যে জানে মিতু এখন ওর রুমে চলে যাবে। তারপর অনেক্ষন লুকিয়ে লুকিয়ে কান্না করবে। কিন্তু কথাটা তিনি না বলেও শেষমেশ পারলেন না। আসলেই মিতু সেদিন অনেক কান্না করল। তার জীবনটা আগে অনেক সাজানো গোছানো ছিলো। এখন তার জীবনটা এলোমেলো হয়ে গেছে। কোন পরিস্থিতিতে কী করবে সেটা বুঝে উঠতে পারে না সে। সেদিন রাতেও মিতু কিছু খেল না। মিতুর বাবা মিতুকে ডাক দিতে গিয়েও ফিরে আসেন। তার সাহস হয় না? নাকি লজ্জা লাগে? ভেবে পায় না সে। মাঝে মাঝে নিজেকেই বাবা হিসেবে ব্যার্থ মনে হয় তার। কী করেছে সে মেয়েটা জন্য? খুঁজতে গিয়ে খুঁজে পায় না সে। হয়তো অনেক কিছুই করেছে। তবে মজার বিষয়, এই মুহুর্তে একটাও মনে পড়ছে না।

সকাল বেলা মিতুকে দেখা গেল। নাহ্। আব্দুস সালাম খেয়াল করলেন, তার মেয়ের মুখে অভিমানের ছাপ নেই। বেশ হাঁসিখুশিই আছে। সকাল বেলা মায়ের সাথে রান্নাবান্নায় সাহাজ্য করছে। আজকে ছুটি। তাই মিতু কিছুটা সময় পায় ঘড়টা গোছানোর। মিতুর ঘড়ে গোছানোর মধ্যেও তেমনটা কিছু নেই। তবে মিতুর ভাইয়ের রুমে আছে। অনেক কিছুই আছে। মিতু মাঝে মাঝেই তার ভাইয়ের রুমটা খোলে। তার জামাকাপড়গুলাও আলমারিতে সুন্দর করে সাজানো। জানালার পাশে ছাদ সমান উচু বুকশেলফ। বেশিরভাগই ইংলিশ লেখকদের বই। মিতু ইংলিশ অতটা পড়তে পারে না। তবে বইগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে ভালো লাগে। কী সুন্দর বইয়ের মলাটগুলো। তার ভাইয়ের ঘড়টা সাজানো গোছানো। ভাইয়ের সব কিছু এই ঘড়ের মধ্যেই আছে। তবে ভাইটা নেই।
আজকে সারাদিন অনেক কাজ। এক সপ্তাহের কাজ এই দুই দিনে করতে হয়। কাপড়চোপড় ময়লা হয়ে আছে অনেকদিন ধরে। সেগুলো ধুয়ে দিতে হবে আজকে।
রাতে মিতু বিছানায় শুয়ে আছে। ক্লান্ত সে। প্রতি শুক্রবারে সে এই সময়টা একটু বই পড়ার

সময় পায়। উপন্যাসের বইগুলো অনেকদিন ধরে পড়া হয় না। উপন্যাসের বই পড়া শুরু করলে সেটা নিয়মিত পড়তে হয়। অনেক দিন বিরতি দিলে সেই গল্পের চরিত্র, প্লট কিছুই মাথায় থাকে না। থাকলেও সেটা পড়ার ইচ্ছা থাকে না।
বিছানা থেকে উঠতেই ইচ্ছা করছে না কোনভাবেই। নাহ্। আজকে থাক। বই পড়ার মুড নেই তার। খেয়েদেয়ে একটু ঘুমাতে পারলেই যেন একটু শান্তি পাবে সে।

সময় আরো এগিয়ে যাচ্ছে। মিতু আস্তে আস্তে নিজেকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করছে। বিজয়কে সে বার বার ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করছে। অনেকটা পেরেছে সে। তবে কেন জানি বাজারের সামনে আসলেই তার ছেলেটার কথা মনে পড়ে। ছেলেটাকে এখনো সে দেখতে পায়নি। মিতু তারপরে আর খোঁজার চেষ্টা করে নি। আর কোথায় বা খুঁজবে তাকে?
একদিন সকালে মিতুর মাথায় ভালো একটা আইডিয়া আসলো। সেদিন শুক্রবার মিতু সকালবেলা বাইরে গেল। তার গন্তব্য সেখানে, যেখানে প্রতিদিন রিকসা ভাড়া দেওয়া হয়। কয়েকটি রিকসার দোকান আছে। মিতু প্রতিটা দোকানেই যাবে।
প্রথম সে যেই দোকানটাতে গেল, সেখানে বিজয়ের বর্ণনা দিল। সেখানকার মালিক জানালো, এমন অনেক ছেলেরা তো প্রতিদিনই আসে। কিভাবে খবর নিবে সে?
তবে একসময় মিতু রিকসা হাউজের সামনে পৌছালো। মিতু সেখানকার মালিককে বিজয়ের বর্ণনা দিল। নাম বিজয়। দেখতে অনেকটা ভদ্র ঘড়ের ছেলেদের মতো মনে হয়। ফর্সা। চুলগুলো লম্বা লম্বা করে কাঁটা।
সেখানকার মালিক বলল, এভাবে আপনাকে কার ঠিকানা দিবো বলুন তো? বিজয় নামের অনেক ছেলেই তো আমার কাছে আসে। আর আমি বয়স্ক মানুষ। অতো মানুষের খেয়াল কিভাবে রাখবো?
তাহলে কি শেষমেশ তার কাছ থেকেও কোন প্রকার সাহাজ্য পাওয়া যাবে না? মিতু ব্যার্থ হয়ে যখন ফিরে যেতে যাচ্ছিল। ওই সময় লোকটা মিতুকে পেছন থেকে ডাক দিলো। মিতু ঘুড়ে তাকালো। লোকটা বলল, আপনি যখন এসেছেন তবে আপনাকে একটা কথা বলতে চাই। ছেলেটার নাম আমি কখনো জিজ্ঞেস করি নি। তবে ছেলেটা ফর্সা, দেখতে অনেকটা স্মার্ট। আপনার বর্ণনার মতোই। তবে ওর একটা জিনিস দেখে আমি অবাক হতাম। সেটা হচ্ছে, ছেলেটা রোজ প্রায় আটটার দিকে রিকসার জন্য আসতো। কিন্তু সারা দিন চালাতো না। দশটার সময়ই রিকসা জমা দিয়ে দিতো। আমি নিশ্চিত ছেলেটা নিয়মিত কোন একটা কারণে রিকসা নিত।
মিতু কিছুটা অবাক হয়ে বলল, এখন আসে না?
- অনেকদিন ধরে ছেলেটাকে দেখতে পাচ্ছি না। তবে আমি নিশ্চিত, ছেলেটা আসলে কোন রিকসাচালক না।
- ছেলেটার ঠিকানা জানেন?
- ঠিকানাটা তো তো জানা হয় নি।

সেদিন মিতু বাসায় এসে অনেক চিন্তাভাবনা করল। বার বার তার মনে হচ্ছে ওই ছেলেটাই বিজয়। যে রিকসা নিয়ে আটটা থেকে দশটা পর্যন্ত রিকসা ভাড়া নিয়ে তাকে অফিসে দিয়ে

আসতো। তাছাড়া আগে থেকেও তার কিছুটা সন্দেহ আছে। ছেলেটাকে দেখেও কোনভাবে রিকসাচালক মনে হয় না। এরকম দেখতে স্মার্ট ছেলে, যার কথাবার্তা এতো সুন্দর, সে কেন রিকসা চালাবে? আরো তো কতো পেশা আছে। মিতু এটাই বার বার ভাবে।

অনেক মাস পার হয়ে গেল। মিতু আস্তে আস্তে বিজয়ের সৃতি ভুলে যেতে আরাম্ব করল। ভোলাটাই স্বাভাবিক। মিতু চেষ্টা করেছে ভোলার। অনেকটাই সফল হয়েছে সে। এখন হয়তো বাজারের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সে আর সেই ছেলেটার অপেক্ষা করে না। এখন শুধু ছেলেটাকে চিরোতরে ভোলার অপেক্ষা। তবে সেটা হয়তো কখনোই সম্ভব না। থাকুক ছেলেটা তার সৃতির এক কোনে। অসুবিধা কী?

আব্দুস সালামের ঘড়ে আজকে আরেকজন মেহমান আসলেন। মিতুকে দেখতেই আসলেন। ছেলের বাবা একাই এসেছেন। মিতুকে দেখে অনেক পছন্দই করলো সে। ছেলেও ভালো চাকরী করে। মিতুর বাবা এইবার মিতুকে বলল, এইবার আর প্লিজ না বলিস না। রাজি হয়ে যা। এভাবে আর কতো সময় নষ্ট করবি? এরকম ভালো ছেলে তুই কি আর পাবি?
- আমি বিয়ে করে চলে গেলে তোমাদের কী হবে বাবা?
- কিছুই হবে না। আমাদের নিয়ে তোর চিন্তা করতে হবে না। আমরা ঠিকই ভালো থাকবো।
মিতু রাজি হয়। এইবার বাবার কথাটা সে ফালায় না। মিতু বলে, তুমি যেটা ভালো মনে করো। এখন আর তোমার ইচ্ছার বাইরে যেতে চাই না। আমি বিয়েতে রাজি আছি বাবা।
মিতুর বিয়ে ঠিক হয়। তবে মিতু এখনো ছেলেটাকে দেখে নি। আর ইচ্ছেও নেই। ভেবেছে সে দেখবে না। এমনকি ফোনেও কথা হয়নি একটিবারও।
রাইসা বলল, শুনলাম অবশেষে বিয়েতে রাজি হচ্ছিস?
- হ্যাঁ।
- আলহামদুলিল্লাহ। অনেকদিন পর একটা ভালো সংবাদ শুনলাম। তা তোর হবু জামাই দেখতে কেমন রে?
- দেখিনি।
- মানে? দেখিসনি কেন?
- ইচ্ছা হয় নি।
- তাই বলে তুই দেখবি না? ছেলে যদি পরে পছন্দ না হয়?
- তবে আর কী। তার সাথেই সংসার করতে হবে। জীবনটাই আর কয়দিনের?
- ধুর। তুই হয়তো মজা করছিস।
- নাহ। আমি কেন মজা করতে যাবো?

সেদিন বাসায় গিয়ে মিতু অনেক চিন্তা করলো। যার সাথে বিয়ে হবে তাকে কেন সে দেখবে না? না দেখেই বা লাভটা কী? যার সাথে সে সংসার করবে তাকে সে দেখবে না, তো আর কে দেখবে? মিতু তার বাবার কাছে গিয়ে বলল, ছেলের ছবিটা কোথায় বাবা? আব্দুস সালাম নিজের ফোন থেকে একটা ছেলের ছবি বের করে মিতুর হাতে দিলো। মিতুর বাবা বলল, ছেলেটা কিন্তু দারুন।

একরাম হোসেন ছেলেকে ফোন দিলেন। বিজয় ফোন রিসিভ করে বলল, কেমন আছো বাবা?
- আমি ভালো আছি। তুই কেমন আছিস?
- আছি ভালোই।
- কাল কখন রওনা হবি?
- খুভ ভোরে বাবা। এখন জিনিসপত্র গোচ্ছাচ্ছি। সকাল ৭ টায় ফ্লাইট।
- সাবধানে আসিস বাবা।
বিজয় ফোন রেখে দেয়। ব্যাগপত্র গোছায় নিজে। কালকে সকালেই সে বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে রওনা হবে। ১৫ দিনের জন্য ছুটি নিয়েছে সে। এটাই অনেক। এই সময়টা দেশে যাওয়ার ইচ্ছা কোনভাবেই ছিলো না তার। বাবার কড়া আদেশ। যেকোনো ভাবেই এই কয়েকদিনের মধ্যেই দেশে আসতে হবে তাকে। কী আর করার আছে? ছুটি নিয়ে চলে আসতে হয় তাকে।
৭ টায় ফ্লাইট। বিমানে উঠে বার বার মিতু নামের মেয়েটার কথা মনে হল। কেমন আছে মেয়েটা? বিয়ে হয়ে গেছে কি? বিজয়ের কথা কি আর মনে পড়ে? তবে বিজয় মেয়েটাকে কোনভাবেই ভুলতে পারে নি। এখনো সেই মেয়েটার চেহাড়া মনে পড়ে। মনে পড়ে রিকসায় বসা অবস্তায় তার হাতের স্পর্শ। এগুলো কোনভাবেই ভুলে যাওয়ার নয়।

প্রথমবার যখন সে দেশে এসেছিলো তখন যে আনন্দটা হচ্ছিলো এখন সেরকমটা হচ্ছে না। সবটা যেন স্বাভাবিকই লাগছে। তবে একটা জিনিস বিজয়ের ভালো লাগল। এখন এখানে আষাঢ় মাস চলছে। বিজয় যখন বিমান থেকে নামল তখন আকাশটা মেঘলা। একটু হালকা হালকা বাতাস। দেশের মাটিতে নামার পর যেন মনের মধ্যে থাকা সকল পাথর নেমে গেল। মনটা হালকা হয়ে গেল অনেকটা। এখন নিজের বাড়িতে যেতে পারলেই যেন শান্তি। বাসে উঠে বসলো বিজয়। দেশের বাস সার্ভিসগুলো আরেকটু ভালো হওয়া দরকার। রাস্তার ধুলো, বাসের ঝাকি, একটু পরে মনে হয়, আগের জায়গাতে চলে গেলেই বোধয় ভালো হতো। অন্য সময় হলে হয়তো একটু ঘুম আসতো। এখন আসবে না। এভাবেই যেতে হবে।
বাসায় এসে বিজয় যেন নিজের প্রাণ ফিরে পেল। এসেই বাবাকে সালাম দিল। একরাম হোসেন ছেলেকে বুকে জরিয়ে ধরে বলল, কেমন আছিস বাবা?
- ভালো আছি বাবা।
- আয় ঘড়ে চল। অনেক ক্লান্ত হয়েছিস বোধয়।
- ক্লান্ত কখনোই হতাম না। ঢাকার বাসগুলোর যে অবস্থা। এই দুইটা ঘন্টা আমি কিভাবে আসলাম, আল্লাহ্ ভালো জানে। মাথা ঘুড়াচ্ছে অনেজ।
- তাহলে ফ্রেশ হয়ে নে। খেয়েদেয়ে কিছুক্ষন রেষ্ট নে। আয়।

খেয়েদেয়ে একটু বিশ্রাম করে সে। একটু ঘুমানোর পর বিকেলবেলা বিজয় একটু ঘুড়তে বের হয়। জাভেদ, আরিফ ওরা কেউ নেই। পরিচিত মানুষ থাকলেও সময় কাঁটানোর কিছু নেই। জাম গাছটা সেই আগের মতো দাঁড়িয়ে আছে। এখন আকাশ অনেকটা পরিস্কার। শীতের সময়

সে যখন এসেছিল তখন আশেপাশে অন্যরকম একটা আমেজ ছিলো। এখন সেটা আর নেই। বাইরের অস্থায়ী দোকানপাট উঠে গেছে। একটু পর পর বৃষ্টি নামে। বিজয় রাস্তায় কিছুক্ষন হাঁটাহাটি করে। কয়েকজন লোক ডাক দিয়ে বলে, কী বিজয় ভাই? কেমন আছে। কবে এলে? এরকম প্রশ্ন। কিন্তু বসে কথা বলার সময় কারো নেই। সবাই ভয়ানক ব্যাস্ত। শহর নামের জিনিসটাই যেন তৈরি হয়েছে এই ব্যস্ততার জন্য।
সন্ধ্যার পরে আকাশে হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকায়। গুর গুর করে ডেকে আকাশ কালো হয়ে উঠে। বিজয় আর দেরি না করে বাসার দিয়ে রওনা দেয়। আহ্‌, কী দারুন আবহাওয়া। এরকম জিনিস দেখতে যে কতটা ভালো লাগে। কাউকে কি বলা যাবে এই কথা? সবাই কাজের গতি বাড়িয়ে দিচ্ছে। সবার তাড়াহুড়ো। কেউ কি এই ব্যস্ততার শহরে তার মতো আকাশের দিকে তাকিয়ে একটু এর সৌন্দর্য দেখার চেষ্টা করেছে? কী লাভ। তারা তো এমনটা প্রতিনিয়ত দেখে অভ্যস্ত।

ঘড়ে চলে আসে বিজয়। এসে দেখে একরাম হোসেন রান্না করছেন। বিজয় পেছন থেকে বলে, আমার কথা শুনছো না তাহলে। কতোবার বলি একটা কাজের লোকে রেখে নাও। টাকা পয়সার কী অভাব হচ্ছে? এভাবে পুরুষ মানুষ হয়ে রান্না করলে কেমন দেখা যায়?
- কে দেখে? কে আছে আর এই ঘড়ে?
- তবুও। আমি বাসায় কাজের লোক রেখে দিবো ভাবছি।
- কাজের লোক আর কতদিন রাখবি? বিয়েটা তো করতে বলি। এইবার আর তোকে বিয়ে না করে যেতে দিচ্ছি না। কথাগুলো বিজয় মাথা নিচু করে শোনে।
একরাম হোসেন বলে, বিয়েটা করলে আমি একটু রক্ষা পাই। বিজয় চলে আসে সেখান থেকে। এই মুহুর্তে তার বলার মতো কোন ভাষা নেই।

পরদিন সকালে বিজয় ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ হয়ে হালকা নাস্তা করে। তারপর রেডি হয়। একরাম হোসেন স্কুলে যাবেন। বিজয়কে রেডি হতে দেখে তিনি বললেন, কোথায় যাচ্ছিস?
- বাইরে। কিছুক্ষনের জন্য।
- গতবারের মতো পাগলামি করলে কিন্তু খুব খারাপ হবে বলে দিলাম।
- না বাবা। কী যে বলো।

বাজারে অনেক্ষন বসে থাকল বিজয়। অফিসে যাওয়ার সময় হয়েছে মিতুর। এখনি তার আসার সময়। আসলে কী বলবে সে? কী বলার আছে আর? সে কি বলতে পারবে যে সে কোন রিকসাচালক নয়, এতোদিন তার সাথে সে মিথ্যা কথা বলেছে। মিতু কি সেটা মানবে? অনেক্ষন দাঁড়িয়ে থাকলো বিজয়। কিন্তু শাড়ী পড়া মেয়েটার দেখা সে কোনভাবেই পাচ্ছে না। অফিসের সময় পার হয়ে গেছে। মিতু কখনোই এতো দেরি করে নি।
বাসায় চলে আসে সে। কোথায় গেল মিতু? বিজয়ের চোখের সামনে এখনো মেয়েটার চেহাড়া স্পষ্ট ভেসে উঠে। সারাদিন অনেক সুন্দর রোদ ছিলো আজকে। একরাম হোসেন বাসায় এসে দেখল বিজয় বসে ল্যাপটপে কাজ করছে। একরাম হোসেন বলল, তাহলে এতোদিনে বুদ্ধি হয়েছে।
- কেন বললে কথাটা?

- ভেবেছিলাম রিকসা হকাচ্ছিস কিনা।
ল্যাপটপটা বন্ধ করে সেখান থেকে উঠে নিজের রুমে চলে যায় বিজয়। একরাম হোসেন আর কিছু বলে না। সে নিজেও খুব ক্লান্ত। ইদানিং বাচ্চাকাচ্চারা খুব জাঁলায়। মাথা হেট করে ছাড়ে। তার ভাবনা, বিজকে ভালোভাবে বিয়েটা করিয়ে দিতে পারলে স্কুলের চাকরিটা সে ছেড়ে দিবে।

সেদিন বিকেল বেলা বিজয় মিতুর অফিসের সামনে গেল। কিছুক্ষন দাঁড়িয়ে থাকল। অনেক্ষন পরে অফিস ছুটি হলো। সবাই বের হচ্ছে আস্তে আস্তে। অনেক মেয়ে চারপাশে। তবে মিতু নামের মেয়েটাকে সে কোনভাবেই দেখতে পেল না। কোথায় গেল মেয়েটা। আজকে কি অফিসে আসে নি? নানান চিন্তা মাথায় আসতে লাগল। এমন সময় একটা মেয়ে কন্ঠের কেউ তার নাম ধরে ডাকল। বিজয় মেয়েটার দিকে তাকিয়ে দেখল, মেয়েটা অবাক হয়ে বিজয়ের দিকে তাকিয়ে আছে।
- আপনার নাম নিশ্চই বিজয়?
- হ্যাঁ। আপনি কিভাবে জানলেন?
- আপনি তো অই ছেলেটা, যেকিনা মিতুকে প্রতিদিন রিকসায় করে নিয়ে আসতেন। আপনাকে কিভাবে ভুলতে পারি। মিতু তো আপনার কথা সারাক্ষন বলতো।
বিজয় যেন কিছুক্ষন অবাক হয়ে রইল। তারপর বলল, মিতু এখন কোথায়?
- মিতু চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছে।
- মানে?
- হ্যাঁ। ওর বিয়ে ঠিক হয়েছে। শুনলাম বিয়ে ঠিকঠাক করা হয়েছে। তাই চাকরিটা আর করতে চায় না।

বিজয় চারপাশটা কেমন যেন অন্ধকার দেখতে লাগলো। মিতু নামের মেয়েটার বিয়ে। এটা বিজয় যেন কোনভাবেই মেনে নিতে পারছে না।
রাইসা আর বিজয় রাস্তা দিয়ে হাঁটছে। রাইসা বলল, আপনাকে আমি মাঝে মাঝে খেয়াল করেছি। আপনি মিতুকে প্রতিদিন রিকসা করে অফিসে নিয়ে আসতেন। তবে আপনাকে দেখে আমার কোনভাবেই রিকসাওয়ালা মনে হয় না। প্লিজ আমাকে কী আপনার সঠিক পরিচয়টা বলবেন? বিজয় দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাইসাকে বলে, বলতাম। তবে এখন মনে হচ্ছে, এসব নিয়ে আপনার চিন্তা না করাই ভালো।
বিজয় চলে আসে সেখান থেকে। মনটা ভেঙে গেছে তার। সেদিন রাতে বিজয়ের ঘুম আসলো না। মিতু অন্য কারো বউ হতে চলেছে, সেটা ভাবতেই বুকের ভেতরটা কেমন যেন লাগছে। বার বার তার চেহাড়াটা চোখের সামনে ভাসছে।
মাঝে মাঝে বিজয় ভাবে, কেন যে সেদিন বন্ধুদের সাথে রিকসা চালানোর বাঁজি ধরলো। সেদিন বাঁজি না ধরলে হয়তো মেয়েটার সাথে কখনোই কথা হতো না। পরিচয়ও হতো না। সেটাই হয়তো তার জন্য ভালো ছিলো। সেদিন মিতু ঠিক কথাই বলেছিলো। একটা গাছ কচি বয়সেই ছেঁটে ফেলে দিতে হয়। যখন সেটা বড় হয়ে যায়। তখন সেটা কাঁটতে অনেক কষ্ট হয়। ভালোবাসাটাও তেমন।
পরদিন সকালে বিজয় নিজের ড্রয়ারটা খুঁজল। মেয়েটার বাসার ঠিকানা সে লিখে রেখেছিলো

একটা কাগজে। সেটা খুঁজে পেল না সে। সমস্যা নেই। জায়গা মনে আছে। এক শুক্রবারে বিজয় মিতুদের বাসার সামনে গেল। বিজয় বাসার নিচে গিয়ে একটা জিনিস দেখে হতাস হয়ে গেল। মিতুদের বারান্দার গ্রিলে যেখানে মিতুর কাপড় ঝুলানো থাকতো সেখানে কিছু বাচ্চা ছেলের কাপড়। মিতুদের ফ্যামিলিতে তো কোন বাচ্চা নেই। তারমানে কি মিতুরা এই বাসা ছেড়ে দিয়েছে?
বাসার কলাপসিবল গেটে তালা দেওয়া। যাতে অপরিচিত কেউ ভিতরে না প্রবেশ করতে পারে। বিজয় আর অপেক্ষা করলো না। কী লাভই বা অপেক্ষা করে? কিছুদিন পরে তার বিয়েই হয়ে যাবে। দেখা করে মায়া বাড়িয়ে কোন লাভ আছে? চলে আসে বিজয়।
বাসায় আসার পর থেকে একরাম হোসেন খেয়াল করছেন তার ছেলের মন অনেকটা খারাপ। কিছুদিন ধরে ঠিকমতো খাওয়াদাওয়া করছে না। একরাম হোসেন ছেলের কাছে এসে বলে, তুই এখনো মনে হয় ওই মেয়েকে নিয়ে চিন্তা করছিস। কিন্তু এভাবে কি জীবন চলবে?
বিজয় চুপ করে আছে। একরাম হোসেন বলল, এসব ভণ্ডামি বাদ দিয়ে নিজের জীবন ঠিক কর। তোর জন্য মেয়ে দেখেছি। এইবার আর তুই না বলতে পারবি না। মেয়ে অনেক সুন্দরী আছে।

বিজয় এর কোন উত্তর দেয় না। কোন প্রতিবাদ করতে চায় না। এখন থেকে সে চেষ্টা করবে নিজের পুরোনো অতীতগুলোকে ভুলে যেতে। একরাম হোসেন বুঝতে পারে ছেলের এখন বিয়ে করা ছাড়া কোন পথ খোলা নেই। একা থাকতে থাকতে সত্যিই খুব খারাপ লাগে এখন তার। বয়স দিন দিন বেড়ে চলছে। স্কুলে বাচ্চাদের পড়ানোটা যদিও আনন্দের কাজ মনে হয়। তবে এই বয়সে সেটা বিপদের কারণও বটে। ক্লাশে জোরে জোরে কথা বললে মাথার মধ্যে ব্যথা করে। এখন এই জীবন থেকে মুক্তি চায় সে। জীবনে অনেক কিছু করেছে সে। নিজেকে আয়নায় বৃদ্ব অবস্থায় দেখে মাঝে মাঝে আঁতকে উঠে সে। এইতো কিছুদিন আগেও সে তরুন ছিলো। বড্ড শক্তপোক্ত পুরুষ। এই কদিনে কী হয়ে গেল? অবসর। অবসরের পরের ধাপ কী? মৃত্যু? তাই তো মনে হয়।

বিজয় বিয়েতে রাজি হয়েছে। বাবার কাছে শিশুর মতো সে আবদার করে, আমার হবু বউকে কি দেখা যাবে না? ফটো নেই কোন? একরাম হোসেন হেসে বলেন, নাহ। ছবি রাখি নি। আর তোকে দেখাবোও না। দেখা করবি এক্কেবারে বাসর ঘড়ে।
- যদি পছন্দ না হয়।
শোন একটা কথা বলি। পছন্দ প্রথম প্রথম নাও হতে পারে। তবে তুই যখন বউয়ের সাথে সংসার করা শুরু করবি, তখন পছন্দ আস্তে আস্তে একাই হতে থাকবে।

একটা ভালোবাসার গল্প

বিজয়েরও বিয়ে ঠিক হয়ে যায়। প্রতিটা ছেলেরই বিয়ের আগে আলাদা এক রকম অনুভুতি হয়। কিভাবে কী করবে, কিভাবে সময় কাঁটাবে একটা অচেনা মেয়ের সাথে। এখন আশেপাশের মানুষ দেখা হলেই বলে, বিজয় ভায়া। শুনলাম বিয়ে করতে যাচ্ছো। বিজয় হালকা হেঁসে বলে, তোদের দোয়ায় হবে আলহামদুলিল্লাহ্।
একরাম হোসেন নিজেই বিয়ের সব কাজ করবেন। অতোটা বড় ভাবে অনুষ্ঠান করা হবে না। পরিচিত কিছু মানুষকেই দাওয়াত করা হবে। বিয়ের সময় নির্ধারণ করা হলো। সামনের সপ্তাহেই বিয়ে। নিজেদের বাসাটা পরিস্কার করা হল। বিয়ের জন্য অনেক কিছু কেনাকাটা করতে হবে। বলতে গেলে বিজয়ের সম্পুর্ণ নতুন একটা অভিজ্ঞতা হচ্ছে।
আস্তে আস্তে বিয়ের সময় ঘনিয়ে আসছে। তবে বিজয় একটা জিনিস ভেবে পাচ্ছে না। মেয়ের ছবিটা এখনো দেখে নি। সে কেমন হবে দেখতে? মেয়ের ব্যবহার যে ভালো হবে সেটা সে নিশ্চিত। তার বাবা পছন্দ করেছেন। অবশ্যই মেয়ে ভালো হবার কথা। বিয়ের কার্ড ছাপা হলো। অনেক আত্বীয়কে জানানো হলো। মেয়ের নাম জান্নাতুল নাঈমা। অনেক সুন্দর নাম।

অবশেষে বিয়ের দিন চলে আসলো বিজয়ের। সকাল থেকেই বাসায় ধুমধাম আরাম্ব হয়ে গেল। অনেক আত্বীয় স্বজনেরা আসতে লাগল। বিজয়ের কয়েকটা বন্ধুও আসল। তবে বিজয়ের মন খারাপ হচ্ছে এটা ভেবে যে জাভেদ আর আরিফ আসতে পারবে না। ওরা সেই ছোটবেলার বন্ধু। হঠাৎ করে ওরা কিসের যেন কাজে আটকে গেছে। আজকের দিনটাতে যে তার অনেক ধকল যাবে এটা সে বুঝতে পারছে। বিজয়ের বাবা ছোটখাটো একটা আয়োজনই করতে চেয়েছিলো, তবে সেটা আর হয়ে উঠে নি। অনেক আত্বীয় এসেছে বাসায়। একটা ওয়েডিং প্ল্যানার টিম ভাড়া করা হয়েছে। ঘড়টা সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে। বিশেষ করে বিয়ের বাসর ঘড়। বিজয়ের মনে নানান রকম চিন্তা জমা হয়। কী হবে তার পরবর্তী জীবনে। একরাম হোসেন বার বার ছেলের কাছে আসছেন। বিজয়ের খবরাখবর নিচ্ছেন।
একরাম হোসেন বলল, সকালে কিছু খেয়েছিস?
- কিছুই খাই নি বাবা। তবে কেন জানি খেতে ইচ্ছা করছে না।
- চিন্তা করছিস?
- না বাবা। চিন্তা কিসের। তুমি তো আছোই।
- হুম। আর বাইরে গিয়ে একটু সবকিছু দেখে আয়। তোর বিয়ে, কেমন করে সাজানো হবে সেটা তুই বলবি।
- সেখানেই রওনা হচ্ছি বাবা।
বিজয় বাইরে আসে। এখনো অতোটা মানুষ আসে নি। দুপুরের দিকে আত্বীয় স্বজন নিয়ে রওনা করা হবে কনে পক্ষের বাড়ির দিকে। আজকে বাইরে খুব সুন্দর রোদ উঠেছে। আশেপাশে কিচিরমিচির স্বরে পাখি ডাকছে। সকালটা অনেক সুন্দর। ওয়েডিং প্ল্যানাররা

সকালেই এসে বাইরের দিকটা সাজাচ্ছে। কয়েক ধরনের ঝাড়বাতি আনা হয়েছে। সকালে এতোটা সুন্দর দেখা না গেলেও রাতে যখন পুরো ঘড়টা আলোকিত হয়ে যাবে, তখন ব্যপারটা দারুন লাগবে।

বেলা এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথেই সবার ব্যাস্ততা বাড়তে লাগলো। বিজয়ের চাচাতো ভাই-বোনেরা এসেছে। চাচাতো বোনেরা হাতে মেহেদী লাগিয়ে দিলো কিছুক্ষন। বিজয়ের খালা আর কাকিরা এসেছে। তারা বসেছে হলুদ নিয়ে। এগুলো দিয়ে নাকি তাকে গোছল করানো হবে। ভেবেই হাঁসি পায় বিজয়ের। হলুদ দিয়ে গোছল করলে শরিরের উজ্জ্বলতা বাড়ে এটাই সে ছোটবেলা থেকে শুনে আসছে। আজকে বাস্তবে তার প্রমান দেখা যাবে।
১১ টার দিকে গোছল করতে বসল বিজয়। একে একে সবাই এসে বিজয়ের গায়ে একটু একটু করে হলুদ মেখে দেওয়া আরাম্ব করল। এভাবে এর আগেও এক বার বিজয়কে হলুদ দিয়ে গোছল করানো হয়েছিলো, যখন বিজয়ের খৎনা করানো হয়েছিলো। তখন অনেক ছোট ছিলো সে। বাপ রে বাপ। তখন ছিলো শীতকাল। শীতের দিনে সকালে আন্টিরা ঠান্ডা হাতে গায়ে হলুদ মেখে দিচ্ছিলো। যদিও এখন গরমকাল। সকালে গোছল করতে ভালোই লাগছে।
গোছল করে যখন বিজয় নিজের ঘড়ে গিয়ে আয়নার সামনে গেল, তখন খেয়াল করে দেখল সে আগের চাইতে একটু ফর্সা হয়েছে। অতোটাও না। নিজের চেহাড়ার দিকে ভালোভাবে তাকানোর সময়ই পায় না সে। পাঞ্জাবি পায়জামা পড়ে রেডি হয়ে নিল। আত্বীয়রা আস্তে আস্তে রেডি হল। তিনটা গাড়ি ভাড়া করা হয়েছে। গাড়িগুলোও সুন্দর করে সাজানো হয়েছে।

দুপুরের পরে রওনা হলো সবাই। তিনটা গাড়ি ভর্তি আত্বীয়। বিজয়ের কাকা-কাকি, মামা-মামী, কাজিনরা সবাই এসেছে। এই প্রথম বিজয় খেয়াল করল, তাদের ফ্যামিলিটা আসলে অনেক বিশাল। তবুও জীবনের অনেক সময় তার নিজেকে একা মনে হয়েছে। কনের বাড়ি বেশি দূরে না। আধা ঘন্টার রাস্তা। গাড়ির ভিতরে কাজিনরা গান চালু করেছে। সবার মুখেই হাঁসি। এসব দেখে বিজয়ের ভালোই লাগছে। সে নিজে গাড়ির এক পাশে পাঞ্জাবী পায়জামা গায়ে গুটিসুটি হয়ে বসে আছে।
একটু পরেই মেয়ের বাড়ি এসে পরে সবাই। গাড়িটা কনেপক্ষের বাড়িতে ঢোকার সাথে সাথে চারদিকে হই হই পরে গেল। জামাই এসেছে, জামাই এসেছে, চারদিকে কথাটা ছড়িয়ে গেল। মেয়ের কানেও এতোক্ষনে হয়তো কথাটা পৌছে গেছে।
গাড়ি থেকে নামা মাত্র এক ঝাক মেয়ে এসে পথ আটকে ধরল। বলল, টাকা না দিলে জামাইকে ভেতরে প্রবেশ করতে দেওয়া যাবে না। কী আর করা। টাকা দিতে হচ্ছে। অবশেষে মেয়েগুলোকে কিছু অর্থ দেওয়ার পর তারা পথ ছেড়ে দিলো।

বিকেলের দিকে খাওয়াদাওয়া হলো। মেয়েপক্ষের বেশি আত্বীয় সে দেখতে পেল না। বিজয় তার কাজিনদের সাথে খেতে বসেছে। খাচ্ছে আর নানান বিষয়ে ওদের মধ্যে আলোচনা হচ্ছে। কাজিনদের সাথে তার নিজের অতোটাও ভালো সম্পর্ক নেই। কখনো ফোনে কথা হয় না। হলেও মাঝে মাঝে। আর দেখা হলে দু-একবার কথা হতো আগে। এখন চাকরি করার পর সে আত্বীয়স্বজনদের প্রায় ভুলতে চলেছে। এসব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ করে একদিকে তাকিয়ে

বিজয় থমকে গেল। একটা মেয়ে খাচ্ছে। মেয়েটাকে বিজয় এর আগেও যেন কোথাও দেখেছে। কোথায়? বড্ড পরিচিত মনে হচ্ছে তাকে। কিন্তু মেয়েটা কে? কোনভাবেই মেয়েটাকে সে মনে করতে পারছে না। খেতে খেতে বার বার বিজয় মেয়েটার দিকে তাকাচ্ছে। কিন্তু বেশিক্ষন তাকাতে পারলো না। কনেপক্ষের সবাই মাঝে মাঝেই বিজয়ের দিকে তাকাচ্ছে। সেই মেয়েটাও বার বার তাকাচ্ছে বিজয়ের দিকে। কী লজ্জার ব্যাপার।
তবে বিজয় মেয়েটাকে বার বার মনে করার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। অবশেষে হাল ছেড়ে দিল সে। এটাও কী দেজাভু? হতে পারে। খাওয়াদাওয়া ভালোই হলো। খেয়েদেয়ে সবাই একেকজন বিশ্রাম নিল। তারপর আসরের নামাজের পর বিয়ের কাজ শুরু হল। কাজি এসেছেন। একে একে আত্মীয়স্বজনরা সবাই এসে উপস্থিত হল। এখন শুধু কনে আসার পালা। এই সময়টা যেন কোনভাবেই কাঁটছে না বিজয়ের।
অনেক্ষন সময় পার হওয়ার পর কনে উপস্থিত হল। লাল বেনারসি পরা। পুরো মুখটা ঘোমটা দিয়ে টানানো। শাড়িটাতে আলো প্রতিফলিত হয়ে মেয়েটাকে চকমক করছে। ছেলেপক্ষ আর মেয়েপক্ষের মধ্যে গাঁধা ফুলের একটা দেয়াল তৈরি করা হয়েছে। কাজি সাহেব বিয়ের কাজ শুরু করলেন।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। ভালোয় ভালোয় বিয়েটা হয়ে গেল। এখন মেয়ের বিদায় নেওয়ার পালা। বিদায় বেলায় প্রতিটা মেয়েই হয়তো কান্না করে এটা ভেবে যে, এতোদিন তারা যে বাড়িটায় নিজের বাড়ি ভেবে থেকেছে। আজ থেকে এই বাড়িতেই আত্মীয় হয়ে মাঝে মাঝে আসতে হবে। হঠাৎ এই পরিবর্তনে প্রতিটা মেয়েই একটা ধাক্কা খায়।
বাসা ভর্তি আত্মীয়। কয়েকজন পরিচিত অপরিচিত ছেলে-মেয়েরা বিজয়ের সাথে ছবি তুলতে এগিয়ে আসলো। সবার সাথে পরিচয় হতে হতে অনেক রাত হয়ে গেল। এইবার বিদায় নেওয়ার পালা। পাত্রীসমেত এইবার রওনা হবে বিজয়দের বাসার দিকে। মেয়েটা যে অনেকটা লজ্জা পাচ্ছে সেটা বিজয় ভালোভাবেই বুঝতে পারছে। মাথা নিচু করে আছে। এখন সে মেয়েটার সাথে কোন কথাই বলছে না। তাকে একটু একা থাকার সুযোগ দেওয়া যাক। বিজয়ও মেয়েটার মতো করেই চুপ করে রইল। পুরো রাস্তায় আর তেমন কারো সাথেই কথা হলো না। স্পিকারে কোন গানও বাঁজল না।
রাতের বেলা পুরো বাসাটা চকচক করছে। নানার রকমের ঝিকিমিকি বাতি জ্বলছে চাকদিকে। বাসা ভর্তি মানুষ। নতুন বউ আনা হয়েছে। সবার মাঝেই এক ধরনের আলাদা রকমের আনন্দ। বিজয় এখনো মেয়েটাকে দেখে নি। কী আযব। এখন মেয়েটা তার নিজের বউ। এখন দেখলে সমস্যা কী? তবে বাবার আদেশ। বাসর ঘড়ের আগে বউয়ের মুখ দেখা যাবে না। বাবাটাও না। কেমন জানি। তাকে সে ভালোভাবে বুঝতেই পারলো না, এতোটা বছর সে বাবার সাথে থেকেও।
বিকেলে খাওয়ার পরে বাসায় এসে আবার খাওয়াদাওয়া পর্ব অনুষ্ঠিত হলেও বিজয় খেল না। পেট ভরা তার। কাজিনরা বাসর রাতের নানান রকম টিপস দেওয়া আরাম্ব করে দিল। অথচ নিজেরা একটাও এখনো বিয়ে করে নি। বাসর রাতে কোন টিপস কাজে আসে না। সবাই জামাইকে যতোই টিপস দিক না কেন। বাসর ঘড়ে ঢুকলে সেগুলো একটাও মনে থাকে না।

সুদীর্ঘ সময় অপেক্ষা করার পর রাত হলো। এখন ঘড়ে প্রবেশ করার পালা। বউ ভিতরে অপেক্ষা করছে। শুনেছি বাসর রাতে এক গ্লাস দুধ নিয়ে যেতে হয়। থাক। অতো নিয়মকানুন কে মানে? অনেক চিন্তাভাবনার পর আস্তে করে দরজা খুলে নিজের রুমে প্রবেশ করল। ভেবেই পাচ্ছে না বিজয় যে, এটা তার নিজের রুম। কিছুদিন আগেও যেই রুমটাতে মাকড়সার জালে ভড়পুর ছিলো, এটাই সেই রুম। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে, সে কোন ভুল বাড়িতে চলে এসেছে।

- আসসালামু আলাইকুম।
- ওয়ালাইকুমুস সালাম।
বিজয় আস্তে করে বিছানায় বসলো। খুব নার্ভাস সে। তবে সেটা দেখে বোঝা যাচ্ছে না। বিজয় হালকা গলায় বলল, কেমন আছেন?
- ভালো আছি। আপনি?
- গলার স্বর এমন লাগছে কেন? ভেঙে ভেঙে আসছে কেন? সর্দি লাগিয়েছেন নাকি?
- হুম। বৃষ্টিতে ভিজেছি। গলা বসে গেছে।
- অসুধ খেতে হবে।
মেয়েটা মাথা ঝাকালো। বিজয় কিছুটা হাঁসিমুখে এইবার বলল, এইবার কি তাহলে আমার প্রিয় বউটাকে দেখতে পাবো না? আমি কিন্তু আপনাকে এখনো দেখি নি। আপনার কোন ছবিও দেখি নি। আমার বাবার নিষেধ ছিলো। এমন বাবা কারো হয়?
মেয়েটা কোন কথা বলল না। বিজয় চুপ করে বসে রইলো বউয়ের সামনে। নিজের হাত দিয়ে বউয়ের ঘোমটাটা খুলবে এই সাহসটা তার হচ্ছে না। অনেক্ষন বসে থাকার পর বিজয় মেয়েটার কাছে একটু গিয়ে গেল। তারপর বলল, দেখি আমার বউটা কতো সুন্দর। এই কথা বলে বিসমিল্লাহ্ বলে মেয়েটার মুখ থেকে ঘোমটাটা আস্তে আস্তে সরিয়ে ফেলল বিজয়।
কী থেকে কী হয়ে গেল বোঝা গেল না। বিজয়ের চোখগুলো বড় বড় হয়ে গেল। তারপর ধপাস করে বিছানার উপর পরে জ্ঞান হাড়াল। মেয়েটা কিছুটা অবাক হবার কথা ছিলো, কিন্তু সে অবাক না হয়ে বিজয়ের পাশে গিয়ে বলতে লাগলো, শুনছেন? কী হলো? ঠিক আছেন? সত্যি অজ্ঞান হয়েছে বিজয়। মেয়েটা জগ থেকে এক গ্লাস পানি এনে বিজয়ের মুখে ছিটানো আরাম্ব করল। কাঁপুনি দিয়ে উঠে পড়ল বিজয়। তারপর সবকিছু বুঝে উঠতে কিছুটা সময় লাগলো। আজকে তার বিয়ে, এখন সে বাসর ঘড়ে আছে। সামনে তার বউ। শাড়ী পড়া। সেই মেয়েটা, যাকে সে আগে প্রতিনিয়তই দেখত। রাস্তার পাশে রিকসার জন্য যে মেয়েটা দাঁড়িয়ে থাকতো, এটা সেই মেয়ে। মিতু। হ্যাঁ। মিতুই তো এটা।
বিজয় অবাক হয়ে বলল, তুমি?
মিতু বলে উঠল, চিনলেন আমাকে তবে?
- এসব কিভাবে হলো?
- মিথ্যেবাদী। এভাবে আমাকে না ঠকালেও পারতেন।
- মানে? কী বলছেন আপনি?
- আপনি রিকসা চালান? আমার সাথে মজা করলেন কেন?
- সত্যি কথা বলতে। শুধুমাত্র আপনার জন্যই এসব করেছি। আপনার সাথে দেখা করার জন্য

রিকসা ছাড়া তো আর উপায় ছিলো না।
- সত্যটা বলে দিলে আমার নিজের এতো ঝামেলা হতো না। সব দোষ আপনার।
- আচ্ছা। আমি মাফ চাইছি। কিন্তু আমার মাথায় একটা জিনিস মোটেও ঢুকছে না যে, বাবার পছন্দে আমি বিয়ে করেছি। বাবা আপনাকে চিনলো কিভাবে?
- আপনার বাবাই তো আমাদের বাসায় এসেছিলো। আর আপনার একটা ছবিও দিয়েছিলো জানেন? আমি দেখে তো আপনার মতোই অজ্ঞান হয়ে গেছিলাম।
- তাহলে আপনি সব কিছু জানতেন?
- হুম।
- আমাকে তো আপনার কোন ছবি-ই দেখায় নি। আমাকে সারপ্রাইজ দিবে বলেছিলো। এখন বিষয়টা বুঝলাম। আপনিই আমার সারপ্রাইজ।
- তো সারপ্রাইজটা কেমন লাগলো?
- আল্লাহ্ আমাকে এতোটা খুশি করে দিবে এতোটা ভেবেও দেখি নি। আল্লাহর কাছে অনেক অনেক শুকরিয়া।
অনেক্ষন কথাবার্তার পর বিজয় বলল, তাহলে জান্নাতুল নাঈমা কে? মিতু বলল, এটা আমার আসল নাম। মিতু আমার বড় ভাইয়ের দেওয়া নাম। এটা মুখে বলা সহজ। তাই। সবাই মিতু বলেই ডাকে।

মিতু আস্তে আস্তে বিজয়কে সব কথা খুলে বলল। অনেক রাত পর্যন্ত দুজন গল্প করল। সকালে ঘুম থেকে উঠে বিজয় দেখল মিতু আগেই উঠে গেছে। বিজয়কে উঠতে দেখে মিতু বলল, উঠেন। ঘুম তো অনেক হলো। বেলা হয়ে গেছে।
বিজয় বিছানা থেকে উঠে ফ্রেস হতে গেল। মিতু বাসাটা টুকটাক গোছানো শুরু করল। এখন থেকে এই ঘড়টাই তার নিজের। জীবনের বাকি স্বপ্নটুকু এখানেই বুনতে হবে। বিজয় ফ্রেস হয়ে ঘড়ে আসলো। এসে দেখলো, মিতু ঘড়ের টুকিটাকি কাজ করছে। বিজয় হঠাৎ পেছন থেকে মিতুকে জড়িয়ে ধরে বলল, অনেক ভালোবাসি তোমাকে। শুধু তোমার জন্যই এতোদিন এসব করেছি। তোমাকে পাওয়ার জন্য।
মিতু বিজয়ের হাতটা ছাড়িয়ে দিয়ে বলল, কী করেছেন আপনি? কিছুই করতে পারেন নি। সব করেছে আপনার বাবা। আর এতোই যখন আমাকে ভালোবাসতেন, তাহলে আমাকে ছেড়ে চলে যেতেন না। জানেন, কতো খুঁজেছি আপনাকে? খুঁজতে খুঁজতে রিকসার মালিকের কাছে চলে গেছিলাম। তবুও সেখানে আপনাকে পাই নি। আমার কান্নাগুলো কী দেখেছেন?
বিজয় কিছু বলার ভাষা খুঁজে পায় না। নিজেও তো অনেকটা ভুল করেছিলো। সেগুলো নিয়ে আর কথা বাড়াতে চায় না। নতুন বিয়ে করেছে সে। এভাবে কথা বলাটা ঠিক হবে না।

শেষমেশ বিজয় পুনারায় মিতুকে দুহাত দিয়ে মিতুকে কাছে টেনে নিয়ে বলে, আমি সত্যিই একটা ভুল করে ফেলেছি। আমাকে ক্ষমা করা যায় না?
মিতু হালকা গলায় বলল, আর কতো ভুল করবেন? আমার সাথে তো প্রতিনিয়তই ভুল করে যাচ্ছেন।
- এমন ভুল তো আমি বার বার করতে চাই।

- ছাড়েন এবার। চলেন, বাবা খাওয়ার জন্য ডেকেছিলেন।

বাসার ছাদে একরাম হোসেন পত্রিকা নিয়ে বসে আছেন। বিজয় হালকা কাশি দিয়ে বাবার সামনে দাঁড়ালো।
- আসসালামু আলাইকুম। বাবা।
- ওয়ালাইকুমুসসালাম। কী খবর?
- আলহামদুলিল্লাহ। ভালো।
- আমার সারপ্রাইজটা কেমন লাগলো? বউকে পছন্দ হয়েছে?
- এসব কিভাবে করলে?
- ম্যাজিক বুঝলি?
- বলো বাবা। এটাই তো সেই মেয়েটা। যার যন্য এতোদিন রিকসা চালালাম।
- তোর ড্রয়ার থেকে সেদিন একটা কাগজ পেলাম। একটা বাসার ঠিকানা। আমার আর বুঝতে বাকি রইলো না যে অইটা অই মেয়েটার বাসারই ঠিকানা। একদিন সময় নিয়ে বাসায় চলে গেলাম। তোর ছবি দেখালাম। আমার ছেলে তুই, রাজি না হয়ে যাবে কোথায়?
- তুমি পারোও বটে। ডাকতে আসলাম। খাবে চলো। একরাম হোসেন পত্রিকাটা ভাঁজ করে চেয়ার থেকে উঠে নিচে নেমে আসলো। সবাই একসাথে খেতে বসলো। খাওয়ার সময় একরাম হোসেন মিতুকে বলল, তা কেমন লাগছে নতুন পরিবারটা?
- ভালো।
- বিজয়ের মা মারা গেছে অনেকদিন হলো। মায়ের আদরের কথা ওর মনে আছে কিনা জানিনা। সেই জন্যই ছেলেটা এমন। মাঝে মাঝে পাগলামি করে।
বিজয় মুখ টিপে বলল, এসব কথা পরে বললে হয় না?
একরাম হোসেন বলতে লাগলেন, এ বাড়িতে তোমার কোন সমস্যা হবে না। এখন বিয়ের সময়টাতে অনেক আত্মীয় আশেপাশে। তবে দুদিন পরে দেখবে কেউ নেই। পুরো বাসাটা ফাঁকা। তখন মনে করবে, পুরো বাসাটাই তোমার।
মিতু কোন কথা বলল না। চুপ করে খেতে লাগলো।

বিকেলবেলা মিতু আর বিজয় সেই লেকটার সামনে গেল। লেকের পানি অনেক বেড়েছে। বর্ষা কাল বলে কথা। বিজয় আর মিতু সেই বেঞ্চটাতে গিয়ে বসলো। বিজয় বলল, কফি খাবে?
- হুম। খাবো।
পাশের দোকান থেকে দুইটা কফি এনে একটা মিতুকে দিয়ে বলল, আজকের পরিবেশটা অনেক সুন্দর। তাই না?
- হ্যাঁ। সত্যিই অনেক সুন্দর।
- গান গাইতে পারো?
মিতু হেসে বলল, নাহ্। আপনি পারেন?
- হুম। শুনবে?
- অবশ্যই।
বিজয় প্রথমটাতে একটা কাঁসি দিয়ে হাল্কা গলায় একটা গান ধরল:

আমি থাকতে চাই তোমার পাশে,
চলে যেও না দূরে।
বুকের মাঝে দু-হাত দিয়ে
রাখবো চেপে ধরে।

তুমি শুধু আমার...
তুমি শুধু আমার...
ভালোবেসে তুমি আমি দিবো,
সাত সুমুদ্র পাড়।

মিতু হেঁসে বলল, বাহ। অনেক সুন্দর গাইতে পারেন আপনি। শিখলেন কিভাবে?
- গান কি কেউ নিজে শিখতে পারে? এটা একটা প্রতিভা।
- আপনার প্রতিভা আছে অনেক দেখা যাচ্ছে।
কিছুক্ষন পর দক্ষিন আকাশটা হঠাৎ করে কালো মেঘে ছেয়ে গেল। পুরো পরিবেশটা অন্ধকার হয়ে গেল। আর কিছুক্ষন পরেই যে বৃষ্টি নামবে সেটা বোঝা গেল। বিজয় বলল, আসো, আজকে যাওয়া যাক। এমনিতেই তোমার সর্দি লেগে আছে। বৃষ্টিতে ভেঁজা যাবে না।
- না। আমি ভিঁজবো আজকে।
- না। আজকে না। বৃষ্টি আরো হবে।
এভাবে বলতে বলতে দুজনের মধ্যে টানাটানি শুরু হয়ে গেল। বিজয় বলল, চলো বাসায়। এসব বলার সাথে সাথেই ঝপঝপ করে বৃষ্টি নেমে গেল। বৃষ্টি এসে দুজনকে কাকের মতো ভিজিয়ে দিয়ে গেল। মিতু এইবার হাঁসতে হাঁসতে বলল, এইবার ভালো হয়েছে না? চলুন বাসায় যাওয়া যাক।

সমাপ্ত